ঐতিহ্য

সংস্কৃতি সাহিত্য

মাহমুদ শাহ কোরেশী
সম্পাদিত

আই. বি. এস. সেমিনার ভল্যুম ৩

ঐতিহ্য সংস্কৃতি সাহিত্য

মাহমুদ শাহ কোরেশী
সম্পাদিত

ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
এর পক্ষে মুহাম্মদ জিয়াদ আলী (সচিব) কর্তৃক
প্রকাশিত। ৩০ - ৬ - ৭৯

প্রচ্ছদ ঃ গোলাম মোস্তফা

মুদ্রণ ঃ মুকুল প্রিন্টিং প্রেস
ঘোড়ামারা রাজশাহী

ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান ঃ কামরান এন্টারপ্রাইজ
হাতেমখান রাজশাহী

মূল্য ঃ টাকা ২৫'০০

AITIHYA SAMSKRITI SAHITYA, IBS Seminar Volume 3. Edited by Mahmud Shah Qureshi and published by Md. Ziad Aly, Secretary, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi and printed at the Mukul Printing Press, Ghoramara, Rajshahi, Bangladesh.

প্রসঙ্গ কথা

উত্তর স্বাধীনতাকালে আমাদের দেশে শিক্ষাঙ্গনের অবক্ষয় একটি প্রচলিত মত। প্রতিবাদী ব্যতিক্রম হয়তো রয়েছে অল্প ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রয়াসে। জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এমনি এক ব্যতিক্রম। সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়ন, গবেষণা, পর্যালোচনা ও প্রকাশনা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। জ্ঞান - বিজ্ঞানের যে সব শাখা - প্রশাখা বাংলাদেশের অতীত, বর্তমান ভবিষ্যত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত, ইনস্টিটিউট তারই অনুশীলনে ব্যাপৃত।

ব্যাপক কার্যক্রমের অন্যতম অধ্যাপকবৃন্দের নিজস্ব বা প্রস্তাবিত বিষয়ে পর্যালোচনার আয়োজন। অত্যন্ত আয়াসসাধ্য এ আয়োজন। বিষয় নির্বাচন, তারিখ নির্ধারণ, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর চৌহদ্দীতে অবস্থানরত বা বাইরের সুধীজনকে আমন্ত্রণ জানান, আলোচনার লিখিত ভাষ্য হস্তগতকরণ, অতিথিবৃন্দের আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা, কয়েক দিন ধরে কর্মী বাহিনীর তদারক, অবশেষে সেমিনারের উদ্বোধন। এসব প্রায় অসম্ভবকাজ সমাধা করেছেন ডক্টর সফর আলী আকন্দ, আই. বি. এস.-এর বর্তমান পরিচালক এবং সামাজিক ইতিহাসের প্রফেসর। তাঁরই প্রস্তাবে ও তত্ত্বাবধানে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসের ৭-৮ তারিখে আই, বি, এস, সম্মেলন কক্ষে The History, Language Literature and Culture of Modern Bengal বিষয়ক

সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উদ্বোধনী ভাষণ দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী। আগাগোড়া মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন বর্তমানে জাহাঙ্গীর-নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বনামখ্যাত প্রফেসর আজিজুর রহমান মল্লিক। সেমিনারে পাঠের জন্য মোট ১৭টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়েছিল। দু'জন প্রবন্ধকার শেষ অবধি ঢাকা চট্টগ্রাম থেকে আসতে পারেন নি। প্রাপ্ত প্রবন্ধের মধ্যে বাংলায় রচিত মাত্র চারটি। এগুলোর ওপর এবং কখনো কখনো ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধগুলোর ওপরও মনোজ্ঞ আলোচনা হয়েছিল বাংলায়। এই আলোচনার বেশীর ভাগ 'ক্যাসেট রেকর্ডার'-এ বাণীবদ্ধ করা হয় প্রথম বারের মতো। অভিজ্ঞতার অভাবে এবং কিছুটা যান্ত্রিক অসুবিধার জন্য এ কাজ অবশ্য আশানুরূপ হয়নি। খুঁত থেকে গিয়েছে অনেক। তবু মূল্যবান কিছু কণ্ঠস্বর ও বিতর্ক আমরা ধরে রাখতে পেরেছি অনিবার্য বিস্মৃতির কবল থেকে। আমরা মনে করেছি, গ্রন্থ প্রকাশের কালে প্রবন্ধগুলোর সঙ্গে এই আলোচনা অবিকল সন্নিবেশিত হলে পরবর্তী কালের পাঠক সেমিনারের জীবন্ত রূপটি অনুভব করতে সক্ষম হবেন। উপকৃত হবেন নানা ভাবে। প্রতিলিপি করণের কাজ হাতে নিয়ে দেখা গেল কাজটি খুবই জটিল ও দীর্ঘসূত্রী। কিছু অংশ অস্পষ্ট, কিছু বা প্রায় দুর্বোধ্য। সেজন্যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঈষৎ সম্পাদনা করতে হয়েছে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক কাঁচা উপাদানগুলোর ক্ষেত্রে। মূল প্রবন্ধের বেলায় আমরা পরিমার্জনার ভার ছেড়ে দিয়েছি লেখকের হাতে। দু-একটি ক্ষেত্রে হয়তো পাঠের অবোধ্যতা দূরীভূত করা হয়েছে ঈষৎ সংশোধনের মাধ্যমে।

বাণীবদ্ধকরণের কাজে আই. বি. এস. ফেলো আফরাউজ জামান চৌধুরী ও মোহাম্মদ আবদুল লতিফ এবং প্রতিলিপি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে

গবেষণা সহকারী সরদার আবদুস সাত্তার এবং এম. এ. শেষ বর্ষ বাংলার ছাত্র জয়নুদ্দিনের অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে। প্রবন্ধ পাঠক, আলোচক সুধীবৃন্দের সাথে তাঁদেরও জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

গ্রন্থ প্রকাশ বর্তমান নানা কারণে বিঘ্নিত। তথাপি ঐতিহ্য সংস্কৃতি সাহিত্য সম্পর্কিত কতিপয় মৌল প্রশ্নের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই বহু বাচনিক গ্রন্থটি সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বিবেচিত হবে।

রাজশাহী
১লা মে, ১৯৭৯

মাহমুদ শাহ কোরেশী
সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের
প্রফেসর, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ
স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাগত ভাষণ

মাননীয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, সমাগত অতিথিবৃন্দ এবং সুধীমণ্ডলী ঃ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ' আয়োজিত ঐতিহ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক 'সেমিনার'এ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। বেশ কিছু কাল পূর্বেই এই 'সেমিনার' অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। তদনুযায়ী আমরা তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণও করেছিলাম, কিন্তু আমাদের আয়ত্তের অতীত নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে 'সেমিনার' 'অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এই 'সেমিনার' যে অনুষ্ঠান করা গেল, তার জন্য আমরা আনন্দিত, আমাদের এতদিনকার শ্রম সার্থক হবার জন্য আমরা কৃতার্থ। 'ইনস্টিটিউট'এর পক্ষ থেকে আমি শুধু এই 'সেমিনার'এর উদ্দেশ্যের কথাটি নিবেদন করতে চাই। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিচয়, বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি, বাংলাদেশের সমাজ জীবন — এক কথায় আমাদের দেশ আর মানুষের সার্বিক জীবনের পরিচয় আবিষ্কার করাই 'ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ' এর কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আমাদের দ্বিতীয় অর্থাৎ বর্তমান 'সেমিনার' এর আয়োজন করা হয়েছে।*

---

* ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে Reflecctions on Bengal Renaissance এর উপর প্রথম 'সেমিনার' অনুষ্ঠিত হয়। 'সেমিনারে' এ পঠিত প্রবন্ধাবলী ১৯৭৭ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

আপনারা জানেন, ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক (এখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রফেসর), যিনি অনুগ্রহ করে এই 'সেমিনার'এ সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয়েছেন, ইতিহাসের গবেষণায় তিনি আমাদের দেশের গৌরব এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকে ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভাইস-চ্যান্সেলর' নিযুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমাদেরই একজন সম্মানিত সহকর্মী ছিলেন। আজ এই 'সেমিনার' উপলক্ষে তাঁকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা বিশেষ আনন্দিত। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ — তিনি তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে আমাদের আয়োজনের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় 'ভাইস-চ্যান্সেলর' এবং 'ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ'এর পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী তাঁর কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এই 'সেমিনার' উদ্বোধন করতে সম্মত হয়েছেন, তার জন্য আমরা অত্যন্ত বাধিত। 'ইনস্টিটিউট'এর পক্ষ থেকে তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে ইতিহাসের গবেষণা ক্ষেত্রে প্রফেসর বারী স্বনাম ধন্য, এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম থেকেই আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় সহকর্মী। তাঁর মত নেতৃস্থানীয় ইতিহাসবেত্তাকে আমাদের সহযাত্রী হিসাবে পেয়ে আমরা আনন্দিত, গর্বিত।

এই 'সেমিনার' আয়োজনে প্রত্যক্ষে ও নেপথ্যে বহুজনের নিরলস অকুণ্ঠ সাহায্য আমরা পেয়েছি। আমি তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক এবং ছাত্র, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের পরিচালক, আমার সহকর্মী-বৃন্দ ও 'ইনস্টিটিউট' এর সমস্ত 'ফেলো' সর্বদা সক্রিয় ভাবে সাহায্যের মাধ্যমে আমাদের উৎসাহ প্রদান করেছেন।

'সেমিনার' কে সার্থক করতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন 'কর্পোরেশন,' দৈনিক বার্তা, 'রেডিও বাংলাদেশ,' এবং বিশেষ করে অগ্রণী ব্যাংক এবং সোনালী ব্যাংকের ভূমিকার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। সবাইকে 'ইনস্টিটিউট' এর ও আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের বিশেষ আনন্দ এবং গর্ব এইখানে যে ইতিহাস, অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেশের খ্যাতিমান পণ্ডিতবর্গ আমাদের 'সেমিনার'এ অংশ গ্রহণ করেছেন। এঁদের অনেকে দূর অঞ্চল থেকে এসেছেন। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশ বিষয়ক এঁদের মূল্যবান বক্তব্যে আমরা অতীব উপকৃত হব। আমাদের আয়োজন ক্ষুদ্র, আতিথ্য প্রদানের সাধ্য সীমিত, তবু সম্মানিত অতিথিবর্গ আপনারা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, এজন্য আমরা ধন্য।

এই অনুষ্ঠানে সমাগত সুধীমণ্ডলী, আপনাদের সবাইকে 'ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ' এর পক্ষ থেকে পুনরায় সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

এস. এ. আকন্দ
পরিচালক
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

উদ্বোধনী ভাষণ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ কর্তৃক আহূত এবং আয়োজিত আধুনিক বাংলার ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক জাতীয় সেমিনার উদ্বোধন করতে আমাকে আহ্বান করে আমার প্রতি আপনারা যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে শুধু নয়, ইতিহাসের একজন নগণ্য ছাত্র এবং ইতিহাসের টানা পোড়েনে নানা সমস্যা-সংকুল এই দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আজ আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আমি মনে করি, আমাদের দেশের ইতিহাস জানার প্রয়োজন আমাদের সকলের আছে, কারণ দেশের ইতিহাস যদি আমরা জানতে না পারি, তার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা অনুধাবন করতে যদি না পারি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ কোথায় খুঁজে পাব ?

বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার বহু প্রয়াস অতীতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে। সে সব উদ্যোগ নিঃসংশয়ে প্রশংসনীয় হলেও আমাদের আজ স্বীকার না করে উপায় নেই যে আমাদের একটি সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হবার অপেক্ষায় রয়েছে। দেশের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস — একটি সমন্বিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার প্রয়োজন আমরা সব সময় অনুভব করে আসছি।

এ বিষয়ে আমাদের পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় চিন্তা ভাবনা যে করেননি তা আমি বলব না, কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার যে পূর্বশর্ত — অর্থাৎ ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ, পুরাতাত্ত্বিক, নৃবিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের সমবেত চেষ্টা এবং একটি সুপারিকল্পিত সমন্বিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, তারই অভাব আমরা বিশেষ ভাবে অনুভব করছি এবং এই অভাবই আমাদের পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস রচনায় পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে — এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

আমাদের সার্বিক পরিচয় জ্ঞাপক ইতিবৃত্ত আজও রচিত হয় নি যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে আমাদের দেশের ইতিহাস অপেক্ষা করেও থাকে নি। স্বাভাবিক গতিতেই তার চক্র আবর্তিত হয়েছে, দ্রুত বিবর্তিত হয়েছে ঘটনার প্রবাহ। ইতিহাসেরই প্রয়োজনে এক যুগ সন্ধিক্ষণে শুরু হয়েছিল আমাদের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রাম, যাতে আমরা অংশগ্রহণ করেছি, যাকে প্রত্যক্ষ করেছি গভীর প্রত্যাশা নিয়ে। শেষ পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতা লাভও করেছি, আমাদের দেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হবার গৌরবও অর্জন করেছে। কিন্তু এর প্রেক্ষিতে আমরা কি রেখে যাচ্ছি আমাদের আগামীকালের বংশধরদের জন্য ? আমাদের ব্যাপক জাতীয় কর্তব্যের কথা এখানে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই না। আমি শুধু মাত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু থেকে যে সব অনুভূতি, যে সব ঘটনা এই বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনার পশ্চাতে কার্যকরী ছিল, তা কি যথাযথ লিপিবদ্ধ হয়েছে, এই প্রশ্নটি আপনাদের সামনে উত্থাপিত করতে চাই। আমরা জানি, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বের ঘটনা হলেও আমাদের স্বাধীনতা

যুদ্ধের ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপাদানই ইতিমধ্যেই বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হ'তে চলেছে।

আমাদের আত্মপরিচয়ের ইতিহাস বিচিত্র এবং জটিল আমরা বাঙালী, না বাংলাদেশী, কিংবা শুধু বাংলা ভাষাভাষী ? এই 'আইডেন্টিটি ক্রাইসিস' বা আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের বিশেষ প্রয়োজন আজ আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে। তাই, আমাদের স্বরূপ অন্বেষা যে আমাদের প্রাণবন্ত জাতিকে সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে, এতে আমি নিঃসন্দেহ, দৃঢ় প্রত্যয়। কিন্তু তার জন্য চাই আমাদের সার্বিক পরিচয় সমন্বিত ইতিহাস।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ কর্তৃক আয়োজিত এই 'সেমিনার' আমাদের দেশের সার্বিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। এ জাতীয় সেমিনার এর মাধ্যমে স্বদেশকে জানা, স্বদেশের মানুষের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং প্রকৃত ইতিহাস রচনা সম্ভব। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান থেকে এখানে যে সব পণ্ডিত ও সুধী ব্যক্তির আগমন হয়েছে, তাঁদের গবেষণা সমৃদ্ধ প্রবন্ধগুলি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের নিকট আমার বিনীত আরজ, দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার সহায়ক হয় সেই দিকেই যেন তাঁদের গবেষণা প্রয়াসকে তাঁরা প্রাথমিক ও জরুরীভাবে নিবদ্ধ রাখেন। তাঁরা আমাদের বলবেন, আমাদের ইতিহাসের ধারা কি একটা, না একাধিক। কোন একটি বিশেষ কাল বা ঘটনায় তাঁদের গবেষণা প্রয়াসকে সীমিত না রেখে, আমাদের আবহমান কালের

ইতিহাসের গতিপথ আর তার উৎসের সন্ধানে তাঁদের আত্মনিয়োগ করতে হবে এবং সেটাই হবে আমাদের জাতীয় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সঠিক এবং বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ। আমাদের ইতিহাসের কোন একটি যুগকে বাদ দিয়ে বা অবহেলা করে আমাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা কোন দিনই সম্ভব হবে না। অতীত বাংলার ঐতিহ্যকে বাদ দিলে আধুনিক বাংলার ইতিহাস হবে অসম্পূর্ণ। তাই, বাঙ্গালী জাতির শৌর্যবীর্যের ঐতিহ্য, তার স্বাধীনতা প্রীতির কথাকে আমাদের ইতিহাসে অবশ্যই স্থান দিতে হবে।

আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আমাদের গৌরবময় অতীত ইতিহাসের অনেক চিহ্ন, অনেক উপাদান, আমাদের অবহেলায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শিলা ও তাম্রলিপি, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন এবং প্রাচীন মুদ্রা, যা আমাদের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রয়েছে, তার বহুগুণ বেশী ইতিহাস রচনার এই সব মূল্যবান অপরিহার্য উপাদান আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং এখনও যাচ্ছে। পুরাকীর্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আমাদের দেশে মোটেই সন্তোষজনক নয়। মাটির নীচে চাপাপড়া বহু ঐতিহাসিক স্থান এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক খননের অপেক্ষায় রয়েছে। এ গুলির যথাযথ জরীপ আজও হয় নি। সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যে সব স্থানের জরীপ করেছেন তার রিপোর্ট আজও অপ্রকাশিত। তাঁরা সীতাকোট, বাসুবিহার, ময়নামতীতে খনন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তার ফলাফল সমন্বিত রিপোর্ট এখনও প্রকাশ করেন নি। দেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত প্রত্ন নিদর্শনগুলির বিবরণ মূলক তালিকা আজও প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এ যাবৎ সংগৃহীত তাম্র ও শিলালিপি, মুদ্রা ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলির নির্ভরযোগ্য পাঠোদ্ধার বেশীরভাগ ক্ষেত্রে হয়

নি। আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই অভাবগুলি আজ একটি দুঃখজনক অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অসুবিধাগুলি অতিবিলম্বে দূরীভূত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, নতুবা আমাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মহাভারত থেকে প্রমানিত হয় বাংলার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। অথচ প্রাচীন কালের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের ধারণা কত নগণ্য। বাংলার ঐতিহ্যে বরেন্দ্র সভ্যতার অবদান সম্পর্কে আমরা ক'জন খোঁজ রাখি ? এই অজ্ঞানতা, এই অনীহা আমাদের পক্ষে মারাত্মক। আমাদের স্বরূপ অণ্বেষায় সাফল্য অর্জন করতে হলে আমাদের কোন যুগকেই অবহেলা করলে চলবে না।

আমাদের ইতিহাসে বরেন্দ্র ভূমি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এদেশে বহিরাগত প্রভাবের অনুপ্রবেশের সিংহদ্বার ছিল বরেন্দ্র, একথা বললে অনুত ভাষণ হবে না মোটেই। আর্য, তথা হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, এবং পরিশেষে রাজশক্তি হিসেবে ইসলামের প্রথম আগমন হয়েছে বাংলার এই বরেন্দ্র, ভূমিতেই। আর্য সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতার বাংলাদেশে যে স্ফুরণ হয়েছিল, তার সূত্রপাত হয় বরেন্দ্রে। বাঙালী সভ্যতা ও সংস্কৃতি, বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা ও শৌর্যবীর্যের একদা লীলাভূমি ছিল বরেন্দ্র। এখান থেকেই গৌড় বঙ্গেশ্বর শশাঙ্ক হর্ষবর্ধন আর কামরূপের ভাস্করবর্মার বাহিনীকে পশ্চাদাপসরণ করতে বাধ্য করে রক্ষা করেছিলেন বাংলার স্বাধীনতা। গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজা নির্বাচনের সর্ব প্রথম দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই খৃঃ ৮ম শতাব্দীর বরেন্দ্রভূমিতে। এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত গোপালের বংশধর পাল সম্রাটরা ৮ম-৯ম শতাব্দীতে উত্তর

ভারতে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বরেন্দ্র ছিল তাঁদের পিতৃভূমি। দ্বিতীয় মহীপালের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত হয় বরেন্দ্রের জনসাধারণ তার পুরোধা হয়ে সাময়িক পতন ঘটিয়েছিল পাল সাম্রাজ্যের।

প্রাচীন বরেন্দ্রীর সভ্যতার নিদর্শন খুব একটা অপ্রতুল নয়। আবিষ্কৃত তাম্র ও শিলালিপিগুলি সাক্ষ্য দিচ্ছে সে যুগের প্রশাসন, ভূমিব্যবস্থা ও ধর্ম কর্মের। ভাস্কর্য ও স্থাপত্য নিদর্শনগুলি যেমন সে যুগের শিল্প সংস্কৃতির পরিচয় জ্ঞাপক তেমনি তদানীন্তন অর্থনৈতিক অবস্থার মোটামুটি একটা আভাষ আমরা পাই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধারকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য এবং অন্যান্য ধাতুর মুদ্রা থেকে। আবার তেমনি মুসলিম আমলের স্থাপত্য নিদর্শন, শিলালিপি আর মুদ্রা সে যুগের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার অমূল্য এবং একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান। বাংলাদেশে আর্য্য ও মুসলিম সভ্যতার প্রথম এবং প্রধান ঘাঁটি এই বরেন্দ্র থেকেই সমগ্র বাংলাদেশে উভয় সভ্যতা ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলার ইতিহাসে বরেন্দ্র ভূমিকে তার যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। আমাদের সাবিক পরিচয় সমন্বিত ইতিহাস রচনায় বরেন্দ্রভূমির অবদানের প্রকৃত এবং যথাযথ মূল্যায়ন অবশ্য কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

আমার বক্তব্য থেকে কেউ যেন মনে না করেন বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রয়াস আদৌ হচ্ছে না বা দেশের ইতিহাসবেত্তা, অর্থনীতিবিদ, সমাজ বিজ্ঞানীরা যে বিশেষ কাল বা অঞ্চল নিয়ে গবেষণা করছেন তা আমাদের সাবিক জাতীয় ইতিহাস রচনায় কোন কাজে লাগবে না। আমি বলতে চাই, একটি জাতির প্রামাণ্য, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য যৌথভাবে

উদ্যোগী হতে হবে আমাদের নৃতত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী, প্রত্নতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এবং বিশেষ করে ইতিহাস বেত্তাদের। এঁদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রের গবেষণার ফলগুলোকে সমন্বিত করবার একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা হলেই সম্ভব হবে আমাদের পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস রচনা।

সুখের বিষয়, এ ধরণের একটি ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আজকাল অনেক সুধী ব্যক্তিই অনুধাবন করছেন। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা, ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং সর্বোপরি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত রয়েছেন একাধিক পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফল পঠিত এবং আলোচিত হয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সেমিনার ও সম্মিলনে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্ররা অবশ্য এ ব্যাপারে অগ্রণী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান, সমাজ কর্ম, ইতিহাস, ইসলামী ইতিহাস, বাংলা ও অর্থনীতি বিভাগ এবং বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ম ও ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ আমাদের দেশের ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ বাবস্থা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনেকগুলি গবেষণা প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের জাতীয় এবং পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় তাঁদের গবেষণা বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি আশা করব আমাদের স্বরূপ অণ্বেষায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধী অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী অগ্রণী হবেন এবং আমাদের দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় সর্বান্তঃকরণে সচেষ্ট হবেন। এ বিষয়ে যে আমরা আদৌ পিছিয়ে নেই আমাদের গবেষণা প্রকল্পগুলি এবং গত কয়েক বছরের ছোট বড় বেশ কিছু প্রকাশনা

তার প্রমাণ। এ ছাড়া, প্রধানতঃ এই প্রয়োজনেই আমরা স্থাপন করেছি ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ। বহু প্রকার অসুবিধার মধ্য দিয়েও এর কাজকর্ম এগিয়ে চলেছে এর নির্দিষ্ট লক্ষ্যে — আমাদের স্বরূপ অণ্বেষার দিকে। আরেকটি বিষয়ের দিকে আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি রেখেছি। তা হলো, ঐতিহাসিক প্রমাণাদি সংরক্ষণ তালিকাভুক্তি-করণ এবং সেগুলির যথাযথ ব্যবহার। ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মে সংরক্ষিত প্রত্ননিদর্শন, পুস্তকাদি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহকে এ ব্যাপারে আমরা অকৃপণভাবে কাজে লাগাচ্ছি এবং তাকে সমৃদ্ধ করে তুলবার জন্য সচেষ্ট রয়েছি। এ ছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শহীদস্মৃতি সংগ্রহশালা, যা সমগ্রদেশে একটি তুলনা রহিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠছে। আমাদের বুদ্ধিজীবি মহল যদি এখন সম্মিলিত হয়ে যৌথভাবে দেশের সার্বিক পরিচয় সমন্বিত ইতিহাস রচনার কাজে এগিয়ে আসেন, তাহলেই জাতির জন্য প্রকৃত কল্যাণের পথ প্রশস্ত হবে বলে আমি মনে করি। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই জাতীয় সেমিনার এর উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

মুহাম্মদ আবদুল বারী
ভাইস-চ্যান্সেলর
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সভাপতির ভাষণ

মাননীয় উপাচার্য, 'ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ' এর পরিচালক ও সমবেত সুধীবৃন্দ ঃ

'ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ' কর্তৃক আয়োজিত এ 'সেমিনার'এ যোগদান করতে পেরে আমি জাপনাদের সবার মতই আনন্দিত। 'সেমিনার' এর কর্মকর্তারা আমার উপর মূল সভাপতির দায়িত্ব অর্পণ করে আমার প্রতি যে সৌজন্য দেখিয়েছেন, সেজন্য আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিছুক্ষণ আগে এ 'সেমিনার' উদ্বোধন করলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রফেসর আবদুল বারী। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসের উপর এক সুচিন্তিত ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর এ বক্তব্য 'সেমিনার'এ অংশগ্রহণকারী আমাদের সবাইকে নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করবে।

দুই দিন ব্যাপী এ 'সেমিনার' বাংলাদেশের ইতিহাসের উপর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এদিক থেকে এর গুরুত্ব কতখানি তা বিশেষভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে বাংলাদেশের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও লেখার অপেক্ষায় আছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন জাতি হিসাবে আমরা পৃথিবীর বুকে স্থান লাভ করেছি। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের বয়সও হতে চলেছে সাত বৎসর। কিন্তু আজও আমাদের সত্যিকার

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখা হয়ে উঠে নি। এটা দুঃখের কথা, লজ্জার কথা। দেশ ও জাতির সামনে একটা পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যভিত্তিক ইতিহাস তুলে ধরার দায়িত্ব শিক্ষিত সমাজের। দেশে কবি, সাহিত্যিক ও লেখক আছেন; আছেন ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী। কিন্তু দেশ ও জাতির ইতিহাস লেখার কাজে আজও আমরা আত্মনিয়োগ করতে পারি নাই। এ ব্যাপারে একেবারেই কোন কাজ হয় নাই, আমি এ কথা বলব না। আমাদের ইতিহাসের বিভিন্ন সমস্যার উপর নিশ্চয় অনেক কাজ হয়েছে। কিন্তু যা হয়েছে তা বিক্ষিপ্তভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে—অনেকটা একক প্রচেষ্টায়। একটি আত্মসচেতন জাতি হিসাবে যে ধরণের ইতিহাস প্রণয়ন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, সে ধরণের ইতিহাস লেখার দায়িত্ব নিতে হবে নিবেদিত প্রাণ ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতি-বিদ, সাহিত্যিক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর। এঁদের সম্মিলিত গবেষণা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এ রকম ইতিহাস রচনা সম্ভব।

এদিক দিয়ে আপনাদের এ 'সেমিনার' এর আয়োজন একটি সঠিক পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। এ ধরণের 'সেমিনার' গতবারও এখানে হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগও গত বৎসর এ ধরণের 'সেমিনার' করেছিল। বাংলাদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রতি বৎসর এ ধরণের 'সেমিনার' এবং 'কনফারেন্স' হচ্ছে। এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দেশের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও সমস্যার উপর যত আলোচনা ও গবেষণা হয় ততই ভাল। তাতে করে আমাদের প্রস্তাবিত ইতিহাস লেখার পথ প্রশস্ত হবে।

সুধীবৃন্দ,

গত একশত পঞ্চাশ বৎসরের উর্ধকাল যাবৎ এ দেশের মানুষ ইতিহাস চর্চা করে আসছে।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের আরম্ভ ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ উপ-মহাদেশে ইতিহাস চর্চার সূচনা হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা প্রথম এ কাজে হাত দেন। এঁদের মধ্যে পণ্ডিত রামরাম বসু ও পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা-লঙ্কারের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮০১ সালে প্রকাশিত রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য' এবং ১৮০৮ সালে প্রণীত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী' ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এ দেশে অবস্থানরত খৃষ্টান মিশনারীরাও তাঁদের মিশনারী স্বার্থে কিছু কিছু ইতিহাস লেখেন। সঙ্গত কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ইতিহাস পক্ষপাতদুষ্ট। এদের মধ্যে J. C. Marshman লিখিত History of Bengal (1840) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস নেই বললেই চলে। তবুও এই বই স্কুল কলেজে পাঠ্য হিসাবে গৃহীত হয়।

ইংরাজ ও খৃষ্টান লেখকদের পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস লেখার প্রথম প্রতিবাদ আমরা লক্ষ্য করি ১৮৫৯ সালে — কেদার নাথ দত্তের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক এক গ্রন্থে। কিন্তু এ প্রতিবাদের সুর ছিল স্বাভাবিক ভাবেই দুর্বল। কারণ লেখকের জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ; এবং মনে হয় এ কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন অনেকটা তাবাবেগের বশবর্তী হয়ে।

১৮০০ সাল থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত বাঙালীর ইতিহাস চর্চার পর্যায়কে আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি Period of Immitation বা অনুকরণের যুগ। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বাংলার ইতিহাস', ১৮৫৮ সালে লিখিত নীলমণি বসাকের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', ১৮৭৪ সালে রামকৃষ্ণ মুখার্জীর

'প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস' এই ক্ষেত্রের। গুণগত দিক দিয়ে এসব ইতিহাসের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কারণ, এগুলো ইংরেজ লেখকদেরই অনেকটা অনুকরণ।

১৮৭৫ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত বাঙালীর ইতিহাস চর্চার পর্যায়কে আমরা বলব Period of Inquiry বা অনুসন্ধানের যুগ। শিক্ষিত বাঙালী, এই যুগে অনুকরণকে বর্জন করে, দেশ ও জাতির ইতিহাস লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করে গবেষণার মাধ্যমে, নিষ্ঠার সঙ্গে। এই সময়ে লিখিত রজনীকান্ত গুপ্তের 'বাংলার ইতিহাস' (১৮৭৯) একটি তথ্যবহুল ইতিহাস হিসাবে পরিগণিত।

বাঙালীর ইতিহাস চর্চার এ পর্যায়ে প্রচুর অনুপ্রেরণা যোগায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। 'বঙ্গদর্শন'এ অন্যান্য বিষয় ছাড়াও বঙ্কিম ইতিহাসের বিভিন্ন দিক বিশেষ করে একটা জাতির জীবনে ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গভীর আবেগের সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু, তিনি মূলতঃ হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের উপর গুরুত্ব অর্পণ করেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বঙ্কিম মুসলমানদের মনে করতেন বিদেশী বা বহিরাগত। তাদের ভারত-বর্ষীয় বা বাঙালী বলে তিনি গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে যেমন, 'রাজা সীতারাম', 'আনন্দমঠ', দুর্গেশ-নন্দিনীতে' মুসলমান-বিদ্বেষ অত্যন্ত স্পষ্ট। তবে, তিনি বাংলার সঠিক ও প্রামাণিক ইতিহাস রচনার জন্য শিক্ষিত সমাজকে আহবান জানান।

এ আহবানে প্রথম সাড়া দেন অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। ১৮৯৭ সালে তাঁর লেখা, 'সিরাজউদ্দৌলা' দেশময় প্রবল উত্তেজনা ও ভাবাবেগের সৃষ্টি করে; বাঙালীকে আত্মসচেতন করতে সহায়তা করে। এর পরে ১৯০১ সালে

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'বাংলার ইতিহাস' ক্ষুদ্র হলেও একটি সুষ্ঠু পদক্ষেপ বলে মনে করি।

১৯১০ সালে স্থাপিত হয় দীঘাপতিয়ার রাজকুমার শরৎকুমার রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি। গবেষণা, ইতিহাস চর্চা, এবং বাংলার ইতিহাসের জন্য উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা বিরাট এবং সর্বজনস্বীকৃত। রমাপ্রসাদ চন্দের 'গৌড়রাজমালা' এবং অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র 'গৌড়লেখমালা' এ সময়ের বিশেষ গবেষণামূলক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক কাজ। এর ঠিক পর পরই আবির্ভাব ঘটে, প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টিকারী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ১৯১৪ সালে তাঁর লিখিত দুই খণ্ড 'বাংলার ইতিহাস' একটি সার্থক প্রচেষ্টা বলে আমি মনে করি।

তারপর ১৯২৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের অনেক ইতিহাস রচিত হয়েছে। এ সময়ের লেখার বিস্তারিত আলোচনায় আমি যাব না। এ পর্যায়ে বিক্ষিপ্তভাবে ও একক চেষ্টায় জেলা, অঞ্চল ও পরগণাভিত্তিক ইতিহাস রচনার কিছু কাজ হয়। এগুলোর কোনটাই পূর্ণাঙ্গতার দাবী করতে পারে না।

এসময় বাংলার ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত History of Bengal, Vol. I (1943) আমাদের প্রশংসার দাবী রাখে। এ গ্রন্থকে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রাচীন বাংলার একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ইতিহাস লেখার সার্থক প্রয়াস বলে আমরা গণ্য করতে পারি। কিন্তু একই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিকল্পিত, যদুনাথ সরকার সম্পাদিত,

History of Bengal, Vol. II (1948). সে ঐতিহ্য রক্ষায় খুব সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না। এই দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা সাধারণভাবে রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক চিত্র পেলেও তৎকালীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্রই পাই না। কারণ বোধ হয় পর্যাপ্ত উপকরণের অভাব। তবুও স্বীকার করতেই হবে যে এ দুই খণ্ড 'বাংলার ইতিহাস' ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এতে প্রচুর গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই দুইটি গ্রন্থই কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের যৌথ উদ্যোগের ফল।

ইদানিং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একই সূত্র ধরে বাংলার ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড প্রণয়নের কাজে হাত দিয়েছেন। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আমাকে সহ কয়েকজন ঐতিহাসিকের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। আমি আশা করব বিশ্ববিদ্যালয় এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে।

১৯৪৫ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের তিন খণ্ডে 'বাংলার ইতিহাস' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এ অবদান সুধী সমাজে সাদরে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আমার মতে এই তিনখণ্ড 'বাংলার ইতিহাসের' মধ্যে প্রাচীন বাংলার উপর লেখা প্রথম খণ্ড একটা অত্যন্ত উন্নতমানের ইতিহাস। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে মধ্য ও আধুনিক যুগের বিভিন্ন বিষয় এবং ঘটনার বিশ্লেষণ, অথবা এ সমস্ত বিষয় ও ঘটনাবলীর উপর তাঁর মন্তব্য সব ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। বিভিন্ন যুগের আলোচনায়ও ভারসাম্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হিসেবে হয়ত বলা যেতে পারে যে ডঃ মজুমদার জীবনের

অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের গবেষণায়। এ ক্ষেত্রে তিনি একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ বলে দেশ-বিদেশে পরিচিত। যে সময় ও পরিশ্রম তিনি এক্ষেত্রে ব্যয় করেছেন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলার ইতিহাস ও গবেষণার ক্ষেত্রে তা তিনি করতে পারেন নাই। তাই তাঁর কাছ থেকে মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলার কোন ত্রুটিহীন লেখা আমরা সম্ভবতঃ আশা করতে পারি না।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, অনেক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। ভারতে হিন্দু মুসলিম স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ, ভারতীয় মুসলমানদের একটা স্বতন্ত্র আবাস ভূমির দাবী ও পরবর্তীকালে পাকিস্তান অর্জন, এই পটভূমিকে কেন্দ্র করে দেশে ও বিদেশে অনেক কাজ হয়েছে। এ সময়কার ভারতবর্ষের, পাকিস্তানের এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাস চর্চা অনেকটা এই পটভূমি বা পশ্চাৎভূমির ঘটনাবলী দ্বারা বেশ প্রভাবান্বিত বলে আমার ধারণা। এই সময় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের, বিশেষ করে আধুনিক যুগের ইতিহাসের উপর অনেক কাজ করেছেন। তাঁদের অনেকের গবেষণার ফলাফল বই আকারে প্রকাশিতও হয়েছে। রাজনৈতিক ইতিহাসের চাইতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপর গবেষণা করার স্পৃহা এ যুগে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ সমস্ত গবেষণামূলক বই অথবা গবেষণার ফলাফল মূল্যায়ন করার চেষ্টা আমি করব না। কারণ এর জন্য সময় ও সুযোগের প্রয়োজন। এসব কাজ যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ প্রবীণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক, অনেক আবার নবীন, কিন্তু আমাদের

দেশের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনাময় ব্যক্তি। আমাদের দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তাঁরা অধ্যাপনা বা প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত আছেন। তাঁদের গবেষণার ফলাফল বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এই সময়ের মধ্যেই বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে নীহার রঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে (১৯৫০) যে অবদান রেখেছেন তার উল্লেখ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এ গ্রন্থে আমরা প্রাচীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাই। ব্যক্তিগত গবেষণার ফলাফলের চাইতে, এ পর্যন্ত যত গবেষণা এ ক্ষেত্রে হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করেই এ ইতিহাস লেখা হয়েছে। ১০০০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে মাত্র ৯৭ পৃষ্ঠার মধ্যে দশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাসকে অনেকটা ধর্মীয়, সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটভূমিকা হিসাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। সামান্য দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে, এ গ্রন্থকে প্রাচীন বাংলার উপর একটা অনন্য অবদান বলে গ্রহণ করা যায়। বাংলার মধ্য ও আধুনিক যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপর এ ধরণের গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা এখনও বিদ্যমান।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে, অর্থাৎ ১৯৭১ সাল থেকে বাংলার ইতিহাসের উপর নতুন উদ্যমে কাজ হচ্ছে। অনেকে ভাল কাজ করেছেন, অনেকে আবার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টাও করে চলেছেন। এ সমস্ত কাজের মূল্যায়ন করার সময় এখনও হয় নাই।

দেশের অনেক প্রবীণ ও নবীন ঐতিহাসিক, ও অর্থনীতিবিদ, সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আমাদের ইতিহাস ও সাহিত্য, ও ভাষা ও সংস্কৃতির উপর তাঁদের গবেষণামূলক কাজের মাধ্যমে জ্ঞানীগুণী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সত্য, কিন্তু এতদসত্বেও আজ পর্যন্ত দেশ ও জাতির একটি পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল বিজ্ঞানসম্মত সুপাঠ্য কোন ইতিহাস আমাদের নাই। এমন কি, আমাদের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামের উপরও একটি তথ্যভিত্তিক ও বিস্তারিত ইতিহাস আজও লেখার অপেক্ষায় রয়েছে। ইদানিং সরকারের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করা হচ্ছে। এটা আনন্দের কথা, উৎসাহের কথা। কিন্তু এতে সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদান বা দলিলপত্রের সদ্ব্যবহার যাতে হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। দেশের প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের এ সব ঐতিহাসিক মাল-মশলা ব্যবহারের সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে হবে, যাতে করে আমাদের জাতীয় জীবনের এই বিশেষ ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের ইতিহাস সঠিকভাবে লিখিত হয়। এ সংগ্রামের ইতিহাসকে কোন দিক দিয়ে কেউ যেন বিকৃত করতে না পারে সে দিকেও আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ইতিহাস জাতীয় জীবনে যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সুধী সমাজকে সে কথা ব্যাখ্যা করে বুঝাবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। ইতিহাস একটা জাতিকে আত্মসচেতন করে, জাতির ঐতিহ্য রক্ষায় ও প্রসারণে সাহায্য করে, জাতিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে, প্রয়োজনে দেশ ও জাতির জন্য আত্মত্যাগের প্রেরণাও যোগায়। একটি সুস্থ সবল, প্রগতিশীল, এবং সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে ইতিহাসের ভূমিকা নিঃসন্দেহে বিরাট। ইতিহাস জাতির পরিচয় বহনকারী দলিল। যে জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই সে জাতি পরিচয়হীন— তার বর্তমান সংকটময় ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হতে বাধ্য। এ পরিস্থিতি থেকে জাতিকে উদ্ধার করার জন্য অবিলম্বে আমাদের একটা

পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার প্রয়োজন প্রকটভাবে বিদ্যমান। কারও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এত বড় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক, বিভিন্নক্ষেত্রে গবেষণা বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর যৌথ ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমেই দেশ ও জাতির একটা পরিপূর্ণ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ ইতিহাস প্রণয়ন সম্ভব। এ ধরণের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ আমাদের মধ্যে অবশ্যই আছেন। এ কাজে হাত দিতে হলে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রয়োজন, প্রয়োজন অর্থের, প্রয়োজন প্রেরণামূলক পরিবেশের। এ দায়িত্ব যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা 'ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ' এর মত কোন গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান হাতে নিতে পারে এবং নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

একই সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন দিকের উপর, বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতির বিভিন্ন দিক ও সমস্যার উপর প্রচুর গবেষণা ও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এবং অনেক বিষয়ের উপর এখনও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে। অনেক সমস্যার উপরই যুক্তি তর্কের অবকাশ আছে। আরও গবেষণার মাধ্যমেই এ সমস্ত তর্কের মীমাংসা হতে পারে।

আমাদের দুই দিন ব্যাপী 'সেমিনার'এ বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা হবে। এতে প্রবন্ধ লেখক ও অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য আমরা শুনব। তাতে করে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হবে, অনেক বিষয়ের উপর তর্কেরও অবসান ঘটবে। এবং তার ফলে আমাদের প্রস্তাবিত ইতিহাস লেখার পথ আরও প্রশস্ত হবে বলে আমি মনে করি।

আজিজুর রহমান মল্লিক
প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচী পত্র

প্রসঙ্গ কথা
৶০ — ।/০

স্বাগত ভাষণ
।৶০ — ।।/০

উদ্বোধনী ভাষণ
।।৶০ — ১৶০

সভাপতির ভাষণ
১৶০ — ১৸০

সূচী পত্র
১৸/০ — ১৸৵০

পরিচিতি
১৶০ — ২৲

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম
বাংলাদেশ ঃ প্রসঙ্গ উত্তরাধিকার
১ — ৪৩ পৃষ্ঠা

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস
৪৫ — ৭৪ পৃষ্ঠা

ওহীদুল আলম
চট্টগ্রামের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি
৭৫ — ১০৭ পৃষ্ঠা

রফিকুল ইসলাম
আধুনিক বাংলা কবিতায় ভিন্ন সুরের সাধনা
১০৯ — ১৫৫ পৃষ্ঠা

পরিচিতি
(অংশ গ্রহণের ক্রম অনুসারে)

ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক
প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ আবদুর রহিম
প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ শফিউদ্দিন জোয়ার্দার
প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ রফিকুল ইসলাম
প্রফেসর বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব হাসান আজিজুল হক
সহকারী প্রফেসর, দর্শন বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ গোলাম মুরশিদ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব আবদুর রহমান
আই. বি. এস-এর এম. ফিল, এক্সটার্নাল
ফেলো ও প্রভাষক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ,
রাজশাহী কলেজ।

ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী
প্রফেসর অব কালচারাল এ্যাণ্ড
ইণ্টেলেকচুয়াল হিষ্টরী, ইনষ্টিটিউট
অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব ওহীদুল আলম
সাবেক স্কুল ইনস্পেকটর,
চট্টগ্রাম।

জনাব আবু তালিব
সহকারী প্রফেসর, বাংলা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ঐতিহ্য সংস্কৃতি সাহিত্য

বাংলাদেশ ঃ প্রসঙ্গ উত্তরাধিকার

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

যে কোন দেশ তথা সেই দেশবাসী জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার প্রাকৃতিক সত্যের ন্যায় শাশ্বত। এবং বলা বাহুল্য, এ প্রসংগে সিদ্ধান্ত তর্কাতীত। অতএব প্রকৃতি-সিদ্ধ এই ব্যাপারটি কদাপি যথেচ্ছ কিংবা নির্দেশিত প্রয়াসে নির্মাণ করা সম্ভব নয়। বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহতা নদীর অনুরূপ। তার স্রোতোধারা মূলোৎসারী আপন সম্পদে, বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে, নানা পরিবেশের লালনে বিচিত্র হয়ে যুগ যুগ ধরে প্রবহমান। সেই বিশেষ জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য, তার উত্তরাধিকার তার নিজ কর্মকাণ্ডের দ্বারা সংগঠিত, পরিবেষ্টনের প্রভাব - প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই পরিবেষ্টন ভৌগলিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক - ব্যাপকতর বলয়ে, বলা যেতে পারে, সাংস্কৃতিক। এইভাবে বহু কালব্যাপী প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মানুষের ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার একটি সুস্পষ্ট অবয়ব গ্রহণ করে। সমস্ত ব্যাপারটাই প্রকৃতিজাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব সমন্বয়ে হয়ে হয়ে ওঠে। অতএব স্বীকার্য যে, সমগ্র দেশে বিস্তৃত, এবং দূর অতীতাবধি বহু মানুষের যে সঞ্চয় কদাপি তা সর্ববিচ্ছিন্ন স্বয়ম্ভু নয়, এবং অকস্মাৎ তা কোন বিশেষ পরিকল্পনা মোতাবেক কিংবা মর্জি মোতাবেক নির্মাণ করা যায় না। কখনো কখনো অবশ্য এ জাতীয় প্রয়াস করা গেছে, এবং অনিবার্যভাবেই তা হঠকারী বলে বিবেচিত হয়েছে। কাল তা অবহেলায় বর্জন করে থাকে।

আমরা জানি, মানুষের যাত্রাপথে তার আপন ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার সম্পর্কিত চেতনা তাকে সজীব রাখে। বাংলাদেশের মানুষের জন্যে এ প্রয়োজন সাম্প্রতিক কালে বিশেষ করেই দেখা দিয়েছে। এর অব্যবহিত কারণ বিগত তিন দশকে সংঘটিত দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঃ

ক. '৪৭-এ ভারত বিভাগ এবং পাকিস্তানের সৃষ্টি,

খ. '৭১-এ সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

প্রত্যক্ষতঃ ঘটনা দু'টি রাজনৈতিক। তবে অবশ্যই ১৯৪৭ এবং ১৯৭১-এর কালান্তরকারী সংঘটন ইতিহাস বিচ্ছিন্ন, আকস্মিক কর্মকাণ্ডমাত্র নয় — এর মূল অনেক গভীরে প্রসারিত। আমাদের সর্বসাধারণের জীবনের সাথে, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সাথে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এই জন্যেই জিজ্ঞাসা — বাংলাদেশের মানুষের পরিচয় কী, তার ঐতিহ্যের, সংস্কৃতির পরিচয় কী — এই সকল ক্ষেত্রে তার উত্তরাধিকারের স্বরূপ কী? কেননা এই পরিচয়ই ত তার সমগ্র অস্তিত্বের পরিচয়। আলোচ্য নিবন্ধে উক্ত আত্মানুসন্ধানের স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস পাওয়া যাবে। তবে অবশ্যই বিষয়টি ব্যাপক, অপর পক্ষে বর্তমান আলোচনায় সে অবকাশ সীমিত। ফলে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য উত্তরাধিকারের স্বরূপ বিষয়ে আপাততঃ একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থাপিত করা যাচ্ছে।

এই সংক্ষিপ্ত রূপরেখা রচনায় আমরা মোটামুটি তিনটি প্রসঙ্গের ওপর আলোকপাত করতে চাইছি ঃ

১. আমাদের দেশের ভূগোল-পরিচয়, ২. আমাদের ভাষার উত্তরাধিকার, ৩. আমাদের সংস্কৃতির স্বরূপ। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা — এই সকল বিষয়ে আমাদের সচেতন জিজ্ঞাসা ঃ আমাদের স্বরূপ অনুসন্ধানের প্রয়াস কতো দিনকার? আমরা জানি এই আবিষ্কারে

আমাদের অভিযানের সূত্রপাত বিগত শতকের ব্যাপার। প্রত্যক্ষতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে এবং তৎসহ নাগরিক ও নোতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব-প্রসারের সাথে আমাদের চেতনায় ঠাঁই করে নিল 'ন্যাশনালিজম' 'স্বাদেশিকতা'র ধারণা[১]। উনবিংশ শতকের ষাটের দশকে রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল মিত্র রীতিমত 'ন্যাশনাল' আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ১৮৬৭তে সংগঠিত হ'ল হিন্দু মেলা। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং তাঁদের অনুসারীদের কর্মোদ্যোগে হিন্দুত্ব আর জাতীয়তা-বোধের চেতনা সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিবেশী মুসলিম সমাজে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন নাগরিক (নবাব) আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী। পরবর্তী পর্যায়ে গ্রাম বাংলায় মুন্সি মেহেরুল্লা, মুন্সি জমিরুদ্দিন প্রমুখ। স্ব সমাজকে এঁরা মুসলমানত্বের পতাকাতলে সংগঠিত করবার প্রয়াস পান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি একটি নোতুন কথা শোনা গেল — 'বঙ্গীয় মোসলমান'।[২] বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক নাগাদ এই বঙ্গীয় মোসলমানের ভাবনায় স্বাদেশিকতার চেতনা সংযোজিত হ'ল। আমরা বিশেষ করে লক্ষ্য করব — এ চেতনা দেশ-চেতনা, মাতৃভাষা-চেতনা, জাতি-চেতনা। প্রসঙ্গতঃ সমকালীন ভাবনার তিনটি নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

ক. 'প্রচারক' ১৯০০ ঃ 'আমরা বাংলাদেশের কথা বিশদরূপে বুঝি। বাঙ্গালি বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া সন্তুষ্ট হই। সহস্র বৎসর যে দেশে বাস করিয়া আসিতেছি, যাহার শীত গ্রীষ্ম, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, দুর্ভিক্ষ, সুখ-সম্পদ, হর্ষ-বিষাদ সমভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছি, সে আমার স্বদেশ নহে, তাহার বাহিরে আবার আমার এক নিজের দেশ আছে, এ কথা কখনও কেহ মনে করিতে পারে না।"[৩]

খ. 'নবনূর', ১৯০৪ : 'বঙ্গভাষা ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে?······গঙ্গাকে ফিরাইয়া নিয়া যেমন তাহার উৎপত্তি স্থান হিমালয়স্থিত নির্ঝরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় না, সেইরূপ বঙ্গীয় মোসলমান সমাজে বঙ্গভাষার প্রচলন রোধ করাও একান্ত অসম্ভব।'[৪]

গ. 'বাসনা', ১৯০৯ : 'আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আরব, পারস্য, আফগানিস্থান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন, অথবা এতদ্দেশ-বাসী হিন্দুই হউন, আমরা এক্ষণে বাঙ্গালী - আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা'।[৫]

সেই আমাদের পিতা-পিতামহের দেশ-চেতনার উন্মেষ।

১

বর্তমানের বাংলাদেশ-পরিচিতির সাথে অবশ্য উপরোক্ত দেশ-ভাবনার চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু প্রসঙ্গটির গুরুত্ব অন্যত্র — সে গুরুত্ব গুণগত। আজকের বাংলাদেশের যে ভূগোল, পূর্বকালীন ঐতিহাসিক বাংলাদেশের ভূগোল অবশ্যই তা নয়। তবে আমাদের বাংলা-দেশের ভৌগলিক যে ঐতিহ্য তা আমাদের আপন সম্পদ। প্রত্নকাল থেকেই সে বাংলাদেশের অবয়ব স্পষ্ট। বিভিন্ন নিদর্শন-প্রমাণাদি থেকে দেশের যে পরিচয় পাই তা নিম্নরূপ :

ক. বগুড়া - রাজশাহী - দিনাজপুর - রংপুর, উত্তরাঞ্চলের এই জনপদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র জনপদ,

খ. গঙ্গা-ভাগীরথীকে পশ্চিমে রেখে যে অঞ্চল সে অঞ্চলের পরিচিতি ছিল বঙ্গ নামে,

গ. 'বৃহৎ সংহিতা'য় উল্লিখিত উপবঙ্গ এবং ১৬শ-১৭শ শতকে আখ্যাত উপবঙ্গ বলতে বোঝাত যশোহর ও তৎসংলগ্ন কাননময় অঞ্চল,

ঘ. প্রাচীন হরিকেল নামক জনপদ বর্তমান কালের শ্রীহট্ট অঞ্চল,

ঙ. চন্দ্রদ্বীপ হচ্ছে বাকলা পরগনা বা বাখরগঞ্জ (বরিশাল) অঞ্চল, এবং

চ. সমতট, যা কি না সমুদ্রশায়ী নিম্নদেশ — গঙ্গা ভাগীরথীর পূর্বতীর থেকে আরম্ভ করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত প্রসারিত সমুদ্রশায়ী ভূখণ্ডকে বলা হ'ত সমতট। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এটাই ভাটি অঞ্চল।

সুপ্রাচীন কালাবধি এই ভৌগলিক অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে খৃষ্টপূর্ব ১০ম-৯ম অব্দের বৈদিক রচনায়, রামায়ণ-মহাভারতে। 'বঙ্গ' শব্দটি প্রথমে ছিল জন পরিচয়বাচক, পরবর্তীতে হ'ল জনপদবাচক বা দেশবাচক। বঙ্গের প্রাচীনত্ব নিরূপণ করতে গিয়ে ডঃ সুকুমার সেন বলছেন, 'বঙ্গ জাতি হইতে দেশবাচক বঙ্গ নামের উৎপত্তি। বঙ্গ জাতি তথা বঙ্গ শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ রহিয়াছে ঐতরেয় আরণ্যকে, সেখানে বলা হইয়াছে যে, তিনটি জাতি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এবং এই তিন জাতি হইতেছে পক্ষী অর্থাৎ পক্ষিসদৃশ যাযাবর বঙ্গ, বগধ এবং চেরপাদ। পূর্ব্ব দিকে ক্রমশঃ হটিতে হটিতে এই যাযাবর বঙ্গজাতি এখন যে স্থানকে পূর্ব্ববঙ্গ বলা হয় তথায় বাস করিতে থাকে, তাহা হইতে পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন নাম হয় - বঙ্গ।'[৬] বলা বাহুল্য এই পূর্ব্ববঙ্গ আজকের বাংলাদেশের অংশ।

বাংলাদেশে আর্যদের প্রথম উপনিবেশ বরেন্দ্রভূমিতে। বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্র-ভূমিরই প্রাচীন নাম পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন। এই ভূমির

অধিবাসী পুণ্ড্রদের উল্লেখ রয়েছে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' (খৃঃ পূঃ ১০ম-৯ম অব্দ)। বরেন্দ্রভূমির পরবর্তী নামান্তর গৌড়। ইতিহাসে মধ্যযুগাবধি গৌড়ভূমি প্রখ্যাত জনপদ।

আর্য উপনিবেশ স্থাপনের প্রাক্কালে এতদঞ্চল আদি অষ্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর বা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর (এদের ভেতরে কোল - মুণ্ডা প্রবলতর গোষ্ঠী) মানুষের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। উত্তর ভারতের আর্যদের দৃষ্টিতে এরা হীন, অন্ত্যজ বলে বিবেচিত হ'ত। এ জন্য আর্যদের এদেশে আগমন বহুকালাবধি নিষিদ্ধ ছিল। এদেশে আগমন করলে তাদেরকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত এবং যারা এদেশে বসতি স্থাপন করত তারা ব্রাত্য, নষ্ট বা পতিত বলে গণ্য হ'ত।

প্রাচীন বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে আর্য উপনিবেশ স্থাপন মৌর্যযুগে। প্রতিবেশী মগধাঞ্চল থেকে প্রথম আগমন যাদের ধর্ম বিশ্বাসে তারা ছিল জৈনমতাবলম্বী। জৈনদের পর আগমন বৌদ্ধদের, তারপর গুপ্ত শাসনামলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, আর্যদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন বরেন্দ্র ভূমিতে। রাঢ় - বরেন্দ্র অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের অনেক কাল পরে আর্য ভাষা - সংস্কৃতির প্রসার অর্থাৎ আর্যীকরণ ঘটে বঙ্গে — দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গের নিম্নভূমিতে। এই কারণে কালভেদে দুই অঞ্চলের সংস্কৃতিতে এবং আচার - আচরণে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয়। তাই তদঞ্চলের অধিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই 'বঙ্গাল' নামে পরিচিত। সেকালে 'বঙ্গাল' সৈন্য ও নৌবলের প্রতাপ ছিল এমন উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সদুক্তি কর্ণামৃত' (১২০৬ খৃঃ অঃ) গ্রন্থে 'বঙ্গাল' কবির কথা পাই।

আর্যীকরণের পরবর্তী পর্বে বহিরাগতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় আরব বণিক সম্প্রদায়। ত্রয়োদশ শতকের পূর্ব থেকেই এদেশে তাদের আগমন অব্যাহত ছিল। সেই সাথে উল্লেখ্য সূফী দরবেশদের আগমন। অপর দিকে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এদেশে

মুসলমান সামরিক অভিযানের সূত্রপাত। আমরা জানি বাণিজ্য, ধর্মের বাণী বিতরণ এবং যুদ্ধবিগ্রহের সাথেই এই সকল প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে নি। আসলে এভাবে বঙ্গভূমিতে বহিরাগত মুসলমানদের অভিযানের পরিণতিতে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তাদের স্থায়ী বসতি স্থাপিত হল। মোগল আমল নাগাদ এই দেশের নাম পরিচিতি 'সুবা বঙ্গালহ্'। মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আইন - ঈ - আকবরী' গ্রন্থে 'বাঙ্গালা' নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শব্দটাকে এইভাবে বিচ্ছেদ করা চলে — বঙ্গ + আল = বাঙ্গাল (বা বাংলা)। নদীমাতৃক দেশ, যে দেশে বারিপতন প্রচুর, সে দেশে বৃষ্টি, বন্যা, জোয়ারের পানি ঠেকাবার জন্য বাঁধ দেয়া হয়ে থাকে। পুনরায়, এ দেশের শস্যক্ষেত্রে আইল (বা আল্) পরিলক্ষিত হয়। অতএব আবুল ফজলের ব্যাখ্যা — যে বঙ্গদেশ আল্ বা আলি বহুল, যে বঙ্গদেশের উপরিভূমির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আল্ সেই দেশই বাঙ্গালা বা বাংলাদেশ।

সুবা বাংলা অবশ্য তৎকালীন বিস্তৃততর সমগ্র বাংলাদেশ। তবে আজকের বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিচিতির পূর্ব ইতিহাসের সন্ধান নিতে হলে উপরোক্ত পটভূমি স্মরণ রাখার প্রয়োজন রয়েছে বলে বিবেচনা করি।

২

আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় প্রসঙ্গ ভাষা বিষয়ক। বাংলা ভাষা বিষয়ে সচেতনতা, মাতৃভাষা বিষয়ে আমাদের আগ্রহ ও প্রেম কত কালের প্রাচীন? প্রাক্ - উনবিংশ শতাব্দীকালে অবশ্য এক ধরণের ভাষা - চেতনার সাক্ষাৎ পাই। সে চেতনা প্রতিক্রিয়ার চেতনা, তার প্রকাশ নিষেধ এবং প্রতিবাদের ক্ষেত্রে। যেমন, দ্বাদশ শতাব্দীর

দিকে দেশীয় ভাষায় (যা কিনা লৌকিক বাংলা ভাষা) শাস্ত্রচর্চাকে পরলোকে রৌরব নরকের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করে প্রতিহত করা হয়েছিল। তখন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে ও সমাজ ব্যবস্থায় দেবভাষা সংস্কৃতও ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের কাল। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে সাধারণ মানুষের মাতৃভাষা চর্চার ক্ষেত্রে ওপরতলার প্রধানদের এই চরম বিধিনিষেধ কেন? মানুষের মনে এর কি কোনই প্রতিক্রিয়া হয় নি, কিংবা জিজ্ঞাসা জাগে নি? ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলায় স্বাধীন সুলতানী স্থাপন করেন। আমরা জানি সুলতানী আমলে রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ত ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা উৎসাহিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, তার দরুণ বাংলা ভাষা চেতনা অবশ্যই প্রসার লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে মোগল শাসনামলে বিপরীত পরিস্থিতির সাক্ষাৎ পাই। ইতিমধ্যে এমন এক ক্ষমতাধর শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যারা দেশীয় জনের মাতৃভাষা চর্চাকে অনুকূল দৃষ্টিতে দেখেন নি — বরং তার বিরোধিতা করেছেন। বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার কারণে তৎকালীন কবি সৈয়দ সুলতান (১৫৫০ - ১৬৪৮) মোনাফেক বলে আখ্যাত হন। কবি আবদুল হাকিমকে (১৬২০ - ১৬৯০) এই ধরনের কটু বাক্য রচনা করে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে হয় — 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।' এই ক'টি নিদর্শন থেকে তৎকালে বাংলা ভাষাবিতর্কের কিছুটা সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এভাবে একদিকে নিষেধ অপরদিকে প্রতিবাদ, এই দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে তখনকার ভাষা চেতনার পরিচয় পাই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভাষা অনুসন্ধান অবশ্য অনেক পরবর্তীকালের ব্যাপার। বাংলা ব্যাকরণ রচনার মাধ্যমে সেই প্রয়াসের সূত্রপাত। উনবিংশ শতাব্দীতে কথাটা প্রথম উঠল — বাংলা ভাষার জন্ম

কোন্ উৎস থেকে? কথা উঠল বাংলা ভাষার প্রকৃতি বিচার নিয়ে। তখনকার পণ্ডিতজনের ধারণা ছিল, বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত। সে কারণে বলা হ'ত বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ এই মতের প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন। কিন্তু বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে প্রমাণিত হল, এ সিদ্ধান্ত যথার্থ নয়, কল্পিত। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ ভাষাপণ্ডিতের গবেষণায় জানা গেল যে, বাংলা ভাষা অবশ্যই সংস্কৃত দুহিতা নয়, এর জন্মেতিহাস, বিবর্তনের ইতিহাস অন্যতর।

তবে বিশেষ করে ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই যে, বাংলা হচ্ছে আর্য ভাষা — ভাষাতাত্ত্বিকদের চিহ্নিতকরণ অনুযায়ী অন্যতম নবীন ভারতীয় আর্য ভাষা। বলা বাহুল্য এই উপমহাদেশে আর্য আগমন এবং আর্য উপনিবেশ স্থাপন - বিস্তারের সাথে তাদের ভাষারও প্রসার ঘটে, এবং কাল ও পরিবেশের বিবর্তনের সাথে ভাষারও বিবর্তন ঘটে। এই ইতিহাস প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসরের ইতিহাস। ভাষা পণ্ডিতেরা উপমহাদেশের ভাষাকে কালের দিক থেকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন :

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (খৃঃ পূঃ ১৫০০ - খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দ),
২. মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা (খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দ - ৮০০ খৃঃ অব্দ)
   এই কাল পর্বের ভাষা পালি - প্রাকৃত - অপভ্রংশ, এবং
৩. নবীন ভারতীয় আর্য ভাষা (৮০০ খৃঃ অঃ - আধুনিক কাল)।
   এই কাল পর্বের ভাষা বাংলা, গুজরাটি, রাজস্থানী, হিন্দী, উর্দু, উড়িয়া, অসমীয়া ইত্যাদি।

এইভাবে নবীন ভারতীয় আর্য ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার কালগত অবস্থান নির্দেশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাপারটাতো বিনা কার্য-কারণহেতু অকস্মাৎ ঘটে যায় নি। ভাষা - সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভু

বলে কিছু নেই। মানুষের ভাষা কি কদাপি নির্ধারিত সন - তারিখ - দিন - ক্ষণ মেনে জন্মায়? ভাষার উদ্ভবের ক্ষেত্রে তেমন পাঁজির হিসাবের সুযোগ নেই। মানব সমাজের প্রবৃদ্ধির সাথে, সভ্যতা - সংস্কৃতির অগ্রযাত্রার সাথে, মানুষের কর্ম - কাণ্ডের বিবর্তন ও তার অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের সাথে বিচিত্র ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে ভাষা 'হয়ে হয়ে' ওঠে। বাংলা ভাষারও উদ্ভব - বিকাশের ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই এমনটি ঘটেছে।

তাই এদেশে জনবসতি স্থাপন ও বসতির বিস্তারের সাথে সাথে বাংলা ভাষার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত। সে ইতিহাস প্রাক্ আর্য আগমন কালের কথা। ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে জন সৌধ কি ভাবে গড়ে উঠেছে সেই প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করা গেলে তার সন্ধান পাওয়া যাবে। সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে, আর্য উপনিবেশ স্থাপনের পূর্বে এতদঞ্চলের জনসমষ্টি আদি - অষ্ট্রেলিয়, মেলাবিড এবং এ্যালপাইন এই জনের সমন্বয়ে গঠিত — পণ্ডিতদের এরকম অভিমত। তাঁদের মতামত আলোচনা করে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুচ্ছেন — 'মোটামুটি ভাবে ইহাই বাংলা ভাষাভাষী জনসৌধের চেহারা, এবং এই জনসৌধের উপরই বাঙালীর ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিচিত্র সঙ্কর জন লইয়াই বাংলার ও বাঙালীর ইতিহাসের সূত্রপাত'।[৭] অতএব, জনগোষ্ঠীর ভাষাই তৎকালীন বাংলাদেশে প্রচলিত, অর্থাৎ প্রাক্ আর্য যুগের ভাষা ছিল। তাদের ব্যবহৃত ভাষা পরিবারের সাধারণ নামকরণ অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা। এর মধ্যে কোল - মুণ্ডা ছিল বিশেষ সম্পন্ন গোষ্ঠীর ভাষা। এবং এই ভাষা ভূখণ্ডের সংলগ্ন ছিল দ্রাবিড় ভাষী জনপদ।

অন্যদিকে উত্তর ও উত্তর পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর্য উপনিবেশ বসতির প্রসারের সাথে স্বভাবতঃই আর্য ভাষার প্রসার সাধন ঘটে এবং গঙ্গা নদীর অববাহিকা অনুসরণ করে আর্য সভ্যতা-

সংস্কৃতির সাথে আর্য ভাষা এইভাবে বঙ্গদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্রমে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা স্তরের প্রাকৃত অপভ্রংশ থেকে আধুনিক কালের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের উদ্ভব — বাংলা তার অন্যতম।

যাই হোক, উত্তরাঞ্চল থেকে পূর্ব ভারতে আর্য অভিযানের ফলে আদিবাসীরা শেষ পর্যন্ত কোথাও কোথাও উৎখাত হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যন্তবাসী হয়েছে, কোথাও বা অপসৃত হয়েছে। প্রবলতর রাজশক্তির, প্রবলতর সংস্কৃতি, জীবন - কর্মকাণ্ডের প্রতাপে এবং প্রভাবে সর্বত্র এমনটিই ঘটে থাকে। বাংলাদেশে আর্য উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই প্রাক্ আর্য ও অনার্য ভাষাকেও তেমনি নবাগত আর্য ভাষার জন্যে স্থান করে দিতে হয়েছে। তবে অবশ্যই সমগ্র ব্যাপারটি বহুকালাবধি নানাবিধ ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটেছে। এ কারণেই প্রাক্ আর্য যুগের ভাষার পলি স্তর পরবর্তী কালীন বাংলা ভাষা প্রবাহে রয়ে গেছে। অতএব, সেই প্রত্ন কালীন অষ্ট্রিক, কোল - মুণ্ডা, দ্রাবিড়, তিব্বত - ব্রহ্মণ গোষ্ঠীর এমন অনেক শব্দরাজি, শব্দরীতি অধুনা যুগের বাংলা ভাষায় আত্মস্থ হয়ে গেছে যেগুলি আমাদের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত। যেমন — 'কুড়ি' শব্দ, কুড়ি দিয়ে; গণনারীতি টি, অরু - আরু, অর - অরা; অল - আল ইত্যাদির প্রয়োগ; ড়া, ড়ি, ডিটা, কুণ্ড ইত্যাদি যোগে স্থানের নামকরণ; বাংলাদেশের অসংখ্য গ্রাম, নদী - নালা, বাজার - হাট - গঞ্জের আপাত দুর্বোধ্য নাম; করাত, দা, বাইগন, পগার, বরজ, বাঁখারি, কানি এই সকল কত শব্দ সেই যুগের চিহ্ন, স্মৃতি বহন করে আনছে এবং আমাদেরকে সেই প্রত্ন প্রাচীনের সাথে সম্পর্কিত করছে।

কালগত দিক থেকে বাংলা ভাষার আত্মীকরণ কবে থেকে? তেমন নির্দিষ্ট প্রমাণ নিদর্শন না থাকলেও পণ্ডিতরা মোটামুটি হিসেবটা

ধরেছেন খৃঃ পূঃ ১০ম - ৯ম শতক থেকে। মহাভারতের সভাপর্বে এদেশের উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গদেশে আর্য উপনিবেশ স্থাপনের সাথে সাথে বাংলা ভাষা আর্যীকরণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় এইভাবে তার বর্ণনা প্রদান করছেন — 'যাহা হউক, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও বেদ - বহির্ভূত আর্য ভাষা প্রবাহের উপর তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল বৈদিক আর্য ভাষার প্রবাহের প্রবল স্রোত। একদিনে নয়, দু - দশ বৎসরে নয়, শত শত বৎসর ধরিয়া এবং কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই ভাষা সমস্ত পূর্বতন ভাষা - প্রবাহকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের সংস্কৃতিকরণ সাধন করিয়া নিজের এক স্বতন্ত্ররূপ গড়িয়া তুলিল।'[৮] বাংলাদেশে প্রচলিত আদিম ভাষার কিভাবে সর্বাঙ্গীন রূপান্তর এবং কিভাবে এক স্বতন্ত্র রূপ - অর্জন সাধন হয় সে সম্পর্কে ডঃ রায়ের বক্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। বাংলাদেশের মূল ভাষা প্রবাহের আর্যীকরণ হয় নূন্যাধিক সহস্র বর্ষ ধরে। কালের হিসাবে এই আর্যীকরণ প্রক্রিয়াকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা ঃ ক. ১০ম - ৯ম খৃঃ পূঃ - ৬ষ্ঠ খৃঃ পূঃ। খ. ৬ষ্ঠ - ৫ম খৃঃ পূঃ শতকে এদেশের পশ্চিমাঞ্চলে জৈনধর্মের প্রসার ঘটে। মহাবীর জিনের নেতৃত্বে নবাগত আর্য ধর্মমত প্রসারের সাথে তদঞ্চলে মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা স্রোত প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। গ. খৃঃ পূঃ ৩য় - ২য় শতকে মৌর্য সম্রাটদের শাসনকালে বাংলাদেশে আর্য ভাষার যে প্রভাব বিস্তৃত হয় তাকে বলা হয়েছে আর্য ভাষার তৃতীয় প্রবাহ। এটাই আর্য ভাষার শেষ প্রবাহ — তখন এ ভাষার মাগধী প্রাকৃত স্তরে অবস্থান। অতঃপর বাংলায় যে প্রাকৃত ভাষার সাক্ষাৎ পাই সে ভাষা মাগধী - অর্ধমাগধীর মোটামুটিভাবে মাগধী - অর্ধমাগধীর মিশ্ররূপ, এবং তাতে অস্ট্রিক, কোল - মুণ্ডা, দ্রাবিড়, তিব্বত - ব্রহ্মণ গোষ্ঠীর আদিম শব্দাবলী বিরাজমান ছিল। লিপি পণ্ডিতদের মতানুযায়ী

এই ভাষায় প্রস্তর উৎকীর্ণ নিদর্শন বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত মহাস্থানগড় শিলালিপি। যাই হোক কালক্রমে প্রাকৃতের রূপান্তর ঘটল অপভ্রংশে। প্রাকৃত এবং স্পষ্টরূপে আদি বাংলার সেতুবন্ধন এই অপভ্রংশ দিয়ে। খৃষ্টাব্দ ৮ম থেকে ১২শ অব্দ অপভ্রংশের স্থিতিকাল বলে বলা হয়ে থাকে। যে বাংলা ভাষার প্রাচীনত্বের সাহিত্যিকরূপ বা লিখিতরূপের সাথে আমরা পরিচিত, সে ভাষার উদ্ভব এই অপভ্রংশের বিবর্তনের মাধ্যমে আর্য পণ্ডিতদের মতানুযায়ী মাগধী কিংবা পূর্বী অপভ্রংশের বিবর্তনের মাধ্যমে নবীন ভারতীয় আর্য ভাষারূপে বাংলা ভাষার উদ্ভব দ্বাদশ শতকের মধ্যে।[৯] তবে বলা বাহুল্য, এই ভাষা অবশ্যই অবিমিশ্র আর্য নয়, জীবিত ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই বহু জনের মুখে, বহু জনপদ ব্যাপী, দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রবহমানতার পরিণতিতে মিশ্র ভাষার রূপ নিয়েছে। এ ভাষার প্রধান উপকরণ যথাক্রমে দেশজ অর্থাৎ আদিম অনার্য এবং বহিরাগত আর্য। উভয় উপকরণের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে বাংলা ভাষার মূল কাঠামো। এতাবৎকাল প্রাপ্ত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যার ভাষা — সাধারণভাবে স্বীকৃত অভিমত অনুযায়ী এই ভাষা হাজার বছরের প্রাচীন।[১০] হাজার বছরের বাংলা ভাষার ইতিহাসকে কালগত দিক থেকে তিনটে ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ ক. আদি যুগের বাংলা ভাষা, খ. মধ্য যুগীয় বাংলা ভাষা, এবং গ. আধুনিক যুগের বাংলা ভাষা। আদি যুগের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ভাষার সূচনায় চর্যাগীতিকা'র ভাষা, যার পরিণতির নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভাষা। বাংলা ভাষা - ইতিহাসের মধ্যযুগের কাল পর্ব পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি ব্যাপ্ত। ইতিপূর্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই বাংলাদেশে বহিরাগত মুসলমানদের আধিপত্যের সূত্রপাত হয়ে গেছে। মুসলমান শাসন আমলে আমাদের ভাষা - ইতিহাসের মধ্য যুগের কালপর্ব ব্যাপ্ত। এই যুগের ভাষা -

নিদর্শনের সাক্ষাৎ পাই গুণরাজ খান, মালাধর বসু রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম মঙ্গল পাঁচালী', বিভিন্ন মঙ্গল কাব্য, কাশীরাম দাসের মহাভারত, বৈষ্ণব পদ সাহিত্য, মুসলমান কবিদের কাব্য সাহিত্যসমূহ, লোক সাহিত্য ইত্যাদি রচনাসমূহ। কবিরা, বিদ্বজ্জনেরা অনুবাদ করেছেন সংস্কৃত থেকে, অতএব ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব, তৎসম - তদ্ভব উপকরণ রয়েছে, অনুবাদ হয়েছে আরবী - ফারসী থেকে, অতএব ভাষায় আরবী - ফারসী উপকরণ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে ; অন্যদিকে লোক সাহিত্যে রয়েছে জনজীবনের আঞ্চলিক ভাষার নিদর্শন। প্রসঙ্গতঃ বিশেষ করেই বলতে হয়, মধ্যযুগে প্রধানতঃ বিদেশাগত মুসলিম আধিপত্যের পাঁচশত সাড়ে পাঁচশত বৎসর কালে আরবী ফারসী - ভাষার উপকরণে ঋদ্ধ হয়েছে এবং বিশেষরূপ গ্রহণ করেছে বাংলা ভাষা। দেশের অভ্যন্তরে জনপদসমূহ, প্রত্যন্ত প্রদেশসমূহে ইসলাম ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে প্রধানতঃ আরবী ভাষার উপকরণ, এবং প্রশাসনের মারফৎ বিস্তার লাভ করেছে তুর্কী - ফারসী ভাষার উপকরণ শব্দরাজি। এভাবে সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই বাংলা ভাষা আত্মস্থ করেছে বিচিত্র বিদেশী শব্দ সম্ভার ও কিয়ৎ পরিমাণে সেগুলির রীতি বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে রয়েছে — রাজদরবার, প্রশাসন - আইন আদালত - রাজস্ব বিষয়ক শব্দ, লড়াই - শিকার বিষয়ক শব্দ, আদব - কায়দা, আচার-আচরণ, পোষাক - বিলাস দ্রব্য, নিত্য ব্যবহার্য বস্তু, ব্যবসা - বাণিজ্য-পেশা এবং ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ। মুসলমান শাসনামলেই ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ বাংলার মাটিতে পোর্তুগীজদের পদার্পণ। তাদের ব্যবসা - বাণিজ্য আর তাদের মিশনারীদের ধর্ম প্রচার কার্যের দরুণ পর্তুগীজ শব্দরাজি ক্রমে মিশে গেছে আমাদের জনজীবনের নিত্য ব্যবহারের সাথে। আরো এসেছে ডাচদের দরুণ ওলন্দাজ শব্দ, ফরাসীদের দরুণ ফরাসী শব্দ। এভাবে বাংলা

ভাষা ইতিহাসের মধ্যযুগে বিদেশী শব্দরাজিতে পরিপুষ্ট হয়েছে আমাদের ভাষার ভাণ্ডার। অবশেষে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইংরিজি শব্দের অনুপ্রবেশ। উল্লেখ্য যে, এ দেশের রাজনীতিতে, প্রশাসনে, অর্থনীতিতে, শিক্ষায় ইংরাজ প্রভাব বিস্তারের সাথে এবং মিশনারীদের প্রচার কর্ম বিস্তারের সাথে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। যুগপৎ ভাষা বিবর্তনের ক্ষেত্রেও আধুনিকত্বের উদ্বোধন। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে পরবর্তীকালে প্রচুর ইংরিজি শব্দ আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি। এমন অনেক ইংরিজি শব্দ গৃহীত হয়েছে যেগুলি বাংলায় তদ্ভব শব্দের মতো হয়ে গেছে, কদাপি সেগুলি চেহারায় ইংরিজি ছিল এমন আবিষ্কার এখন আয়াস সাধ্য। যেমন — লাট, লণ্ঠন, লম্ফ, পারদ, সাব্রী, জাঁদরেল, মানোয়ারী জাহাজ ইত্যাদি। হাফ হাতা জামা, ফুল মোজা, হেড মৌলবী, হেড মিস্তিরি এ ধরণের উপসর্গ যুক্ত-বাংলায় অবলীলায় চলেছে এখন বর্তমান শতকে আন্তর্জাতিক সংযোগের প্রয়োজন এবং অবকাশ যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, ভাষা সেই মতো রূপে, আকারে দ্রুত বিবর্তিত হচ্ছে।

সুদূর অতীত থেকে দীর্ঘকালব্যাপী উপরোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমে হয়ে উঠেছে আজকের আমাদের বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার স্বরূপ নির্ণয়ে ফলতঃ লক্ষ্য করা যেতে পারে ক. দেশজ উপকরণ, যা কিনা আর্য - পূর্ব (অষ্ট্রিক কোল মুণ্ডা, দ্রাবিড়, তিব্বত - ব্রাহ্মণ উপকরণ), খ. আর্য উপকরণ (বাংলা ভাষার দেহ কাঠামো আর্য ভাষার সংস্কৃত - প্রাকৃত প্রভাবে গঠিত), এবং গ. বিদেশী উপকরণ (আরবী - ফার্সী - তুর্কী, পর্তুগীজ - ওলন্দাজ - ফরাসী - ইংরিজি এবং আধুনিক অন্যান্য) — এই সমস্ত উপকরণের সমন্বয়ে এ ভাষার বর্তমান অবয়ব সংগঠিত।

অতএব আমাদের ভাষার উত্তরাধিকার, ঐতিহ্যগত কারণেই সামগ্রিক ভাবে বাংলা ভাষার উত্তরাধিকার।

প্রসঙ্গতঃ সম্প্রতিকালের একটি জিজ্ঞাসা — বিশেষ ভৌগলিক পরিধিতে চিহ্নিত নবজাত রাষ্ট্র বাংলাদেশের ভাষার কি সুস্পষ্ট ভাবে বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অন্যতর একটি রূপায়বয়ব আছে? বলা বাহুল্য প্রত্যক্ষতঃ তেমন কিছুর অস্তিত্ব নেই। তবে আমরা অবশ্যই অবগত আছি ভাষা শক্তি আহরণ করে সাধারণ মানুষের জীবন - চর্চা থেকে — তার কর্ম থেকে, তার মানস ভুবন থেকে। তার সমগ্র জীবনাচরণের প্রয়োজনেই তার ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে ওঠে। অতএব সহজবোধ্য কারণেই বাংলাদেশের ভূগোল বাংলাদেশের মানুষের উৎপাদন কর্ম-শ্রম, জীবনাচরণ, বিশ্বাস - সংস্কার - ধর্মচেতনা, তার রাজনীতি, অর্থনৈতিক জীবন এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে এক বিশেষ প্রভাব ফেলবে তার ভাষায়। 'বিশেষ পরিচয়' বলতে সেটাই বাংলাদেশের আপন ভাষা। (যে অর্থে খোদ সৌদী আরবীয় অপেক্ষা মিশরের 'আপন' আরবী ভাষা, কিংবা ইংল্যাণ্ডের অপেক্ষা আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ার 'আপন' ইংরাজী ভাষা, অথবা অধিকতর সাম্প্রতিক নিদর্শন পশ্চিম জার্মানী অপেক্ষা পূর্ব জার্মানীর 'আপন' জার্মান ভাষা।) 'বাংলাদেশের ভাষা'র যদি বর্তমান চেহারা চিহ্নিত করণে প্রয়াসী হই, তাহলে সম্ভবতঃ উপাদানগত ভাবে এরকম বর্গীকরণ করা যেতে পারেঃ ক. আঞ্চলিক ভাষা, খ. শহুরে বা নাগরিক ভাষা — যে ভাষা সাধারণতঃ নাগরিক জনের আলাপের, সভা-সমিতিতে বক্তৃতার, নাটক - চলচ্চিত্র - বেতার - টেলিভিশনের ভাষা, এবং গ. লেখার ও সাহিত্যের ভাষা। উল্লেখ্য যে, উক্ত খ এবং গ বর্গভুক্ত ভাষার দ্রুত, ব্যাপক বিকাশ ১৯৪৭-এর পরবর্তীকালের ব্যাপার, যদ্যাবধি আমাদের শিক্ষা - সুকুমার কলাচর্চা - সাহিত্য এবং জীবিকার্জন প্রক্রিয়ার রাজধানী কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে। স্বভাবতঃই সেই সাথে প্রমথ চৌধুরী বর্ণিত 'ভাগীরথী তীরবর্তী দক্ষিণদেশী' ভাষার ঢাকায় আগমন। তারপর বিগত তিন দশকাধিক কাল ধরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ ভাষার

ভাণ্ডারে যা কিছু গ্রহণ, বর্জন এবং এর অবয়বে যা কিছু রূপান্তর।

৩

ভাষা প্রসঙ্গের সমান্তরাল আমাদের জন্যে অপর গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান — বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বলতে কি বুঝব? বিষয়টির স্পষ্ট, বিস্তারিত আলোচনা — বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান অবকাশে তার সূত্রপাত করা গেল। প্রশ্নটা হচ্ছে, প্রাক্ ১৯৪৭-এর যে সমগ্র বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে একান্তরোত্তর বাংলাদেশ কি ভাবে সম্পর্কিত? আমাদের উত্তরাধিকার কী সমগ্রের উত্তরাধিকার, অথবা বর্তমানের ভৌগলিক - রাষ্ট্রীয় বাংলাদেশের যে প্রাচীন ভূগোল - সীমা, শুদ্ধমাত্র তদঞ্চলেরই জনপদ-বাসীর উত্তরাধিকার? প্রশ্নটির দ্বিতীয়াংশের অনুসন্ধান - প্রয়াস কী মূলতঃই সম্ভব — তা কতটা স্বাভাবিক, কতটা যুক্তিবহ। এই সকল কথা প্রাসঙ্গিক ভাবেই উঠবে। কেননা প্রাক্ - ১৯৪৭ কাল পূর্বে দু' তিন হাজার বৎসরের বাংলাদেশের জীবনেতিহাস বর্তমানের সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক - রাজনৈতিক বিভাজন দ্বারা কদাপি চিহ্নিত ছিল না। এই ইতিহাস প্রবহ কালাবধি সমগ্রেরই ধারা স্রোত বহন করে এনেছে। তার দরুণ পৌণ্ড্র জনপদে মহাস্থান গড়ের যে ঐতিহ্য, মধ্য যুগে গৌড়ে যে সংস্কৃতি চর্চা, আরাকান রাজদরবার থেকে হুগলী ভুরশুট অবধি যে বাংলা সাহিত্য চর্চা, ইত্যাকার গৌরববাহী সকল উপকরণেই আজকের বাংলাদেশের মানুষের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার। একই কারণে কলকাতা কেন্দ্রিক প্রায় দু'শ বছরের সুকুমার মানসচর্চার যে প্রাণ রসে পরিপুষ্ট হয়েছেন আমাদের পিতা - পিতামহ, বংশধর আমাদেরও ধমনীতে তা প্রবহমান। সর্বোপরি, উক্ত প্রকার প্রাকৃতিক

সত্যের কারণেই কলকাতা - বোলপুর - আসানসোলের পশ্চিমবঙ্গবাসী হয়েও রবীন্দ্রনাথ - নজরুল ইসলাম আমাদের বাংলা সাহিত্য - সংস্কৃতি চর্চার এবং প্রেরণার উৎস।

আমাদের বক্তব্যের প্রমাণ — দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে এই সকল কথা বলা গেল। কিন্তু মূলতঃ সংস্কৃতি ব্যাপারটা কী? সংস্কৃতি ত' জীবন - বিচ্ছিন্ন একটা কিছু নয়। এই জীবন প্রধানতঃ জন মানুষের জীবন — আদিতে এই মানুষ শ্রম নির্ভর, এই মানুষ উৎপাদক। জন মানুষ দেশের মাটির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এদেরই শ্রমের ফসল যে উৎপাদন, সে উৎপাদন থেকে গড়ে ওঠে সমাজ সৌধ। অতএব স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই সংস্কৃতির শিকড় জনজীবনের অন্তরে প্রসারিত।

কথাটা ইংরিজিতে কলচর, বাংলায় কৃষ্টি, সংস্কৃতি। অভিধানের অর্থে কৃষ্টি শব্দের ব্যুৎপত্তি 'কর্ষণ' থেকে এবং 'কর্ষণ' শব্দের মূলার্থ 'হল চালনা'। এভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, কলচর বা 'কৃষ্টি' আদিতে মানুষের উৎপাদিকা শ্রমের সাথেই সম্পৃক্ত। অপর দিকে 'সংস্কৃতি' কথাটা এসেছে 'সংস্কার সাধন' করা থেকে। অভিধানের অর্থানুযায়ী 'সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ' সাধন করা। অতএব 'কৃষ্টি' এবং 'সংস্কৃতি' উভয় শব্দবাচক ব্যাপারই মানুষের কর্মভিত্তিক। এবং এই কর্ম হচ্ছে তার শ্রম প্রয়াস। মানুষের কর্ম - কৃতি থেকেই তার সৃষ্টি সম্পদ যার আমরা পরিচয় পাই তার অর্জিত জ্ঞান - বিজ্ঞানে, তার মানস ভাবনায়, তার সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, চিত্রে, অপরাপর চারুকলায় তথা তার সমগ্র জীবনাচরণে। এই সৃষ্টিই ত' তার সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের পরিচায়ক।

উপরি বর্ণিত সংজ্ঞার আলোকে আমাদের সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি। বলা হয়ে থাকে আবহমান বাংলা সংস্কৃতি। কারণ জীবিত ভাষার ন্যায় আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও

অনুরূপ প্রবহমানতা বিরাজমান। অধিকন্তু আমরা জানি সংস্কৃতি জন মানুষের জীবন - নির্ভর। অতএব বাংলাদেশের সংস্কৃতির পরিচিতি - সন্ধানে এদেশের জনসৌধ গঠনের সংবাদ নেয়া প্রয়োজন। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের এ যাবৎকাল আবিষ্কৃত তথ্যানুযায়ী আদি অস্ট্রেলিয়, মেলানিড এবং এ্যালপাইন এই তিন জন - উপকরণে অধ্যুষিত ছিল প্রত্ন - কালীন বাংলাদেশ। তাদেরকে সাধারণতঃ অনার্য আখ্যায় চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বে এদেশে উত্তর - পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত আর্য জনগোষ্ঠীর উপনিবেশ স্থাপিত হয়, এবং শেষ পর্বে বিদেশ থেকে যে প্রবাহের আগমন সেটা প্রধানতঃ আরবীয় - আফগান - তুর্কী - ইরানী জনের। আনুমানিক তিন হাজার বৎসরে এভাবে এই ভূখণ্ডে একটি সঙ্কর জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়। ইতিহাসের বিপুল এই কর্মকাণ্ডের বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ করেছেন —

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
শত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।

শতাব্দীর পর শতাব্দীর পালা বদলে বহির্বাংলা থেকে বিচিত্র রক্ত, ভাষা, ধর্ম বিশ্বাস - সংস্কার, আর সংস্কৃতির প্রবাহ এসেছে, এসে মিশেছে দেশজ, লোকজ উপাদান - উপকরণের সাথে। এই প্রক্রিয়া ত' সহজে সম্পাদিত হয় নি। সংঘাতে সমন্বয়ে, ক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়ায় অবশেষে গড়ে উঠেছে নোতুন সংস্কৃতি — বাংলাদেশের ভূখণ্ডে সঙ্কর জনগোষ্ঠীর সঙ্কর সংস্কৃতি। শত সহস্র বৎসরের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে অতএব আমরা সেই সংস্কৃতিরই ঐতিহ্য স্মরণ করতে চাই রবীন্দ্র ভাষিত বাণীতে — 'আমার শোণিত রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।' বাংলাদেশের এই সংস্কৃতির (যা কিনা আবহমানকাল ব্যাপী সঙ্কর

জনগোষ্ঠীর শ্রম ও উৎপাদন নির্ভর কর্মকাণ্ডের ফসল) ইতিহাস অদ্যাবধি রচিত হয়নি। কাজটা অবশ্য দুষ্কর, কেননা উপকরণের অভাব। তথাপি নানা বিচ্ছিন্ন উৎস থেকে এই ভূখণ্ডবাসী মানুষের সংস্কৃতি - সাধনার পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব বলে মনে করি। এই পরিচয় রয়েছে বাংলা ভাষা - নিদর্শনে, পাথরে উৎকীর্ণ লিপি - তাম্র - শাসন - দানপত্রে তওয়ারিখ ও রাজমালা জাতীয় রচনায়, কাব্য সাহিত্য' - সঙ্গীতে, নৃত্যে, ছড়া - প্রবচন - প্রবাদ - ধাঁধাঁয়, মন্দির - মসজিদ - দেউল - দূর্গ - প্রাসাদ গাত্রে। আমাদের সংস্কৃতির নিদর্শন আরো পাব আমাদের পূর্বপুরুষের ব্যবহৃত পোষাক - পরিচ্ছদের বিবরণে, আহার অভ্যাসের বিবরণে, তাঁদের সামাজিকও পারিবারিক আচার - আচরণের বিবরণে। এতদ্ব্যতীত লোক সংস্কারে, ধর্ম বিশ্বাসে, ধর্মাচরণেও বিধৃত রয়েছে তৎকালীন মানুষের মানস ভাবনার স্বাক্ষর।

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রবহমান বাঙালী জীবন - সাধনার যে সকল নিদর্শন উদ্ধার করা যায় তা থেকে আপাততঃ একটি সংক্ষিপ্ত রেখা পরিচিতি রচনা করা যাচ্ছে।

ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই অবগত আছেন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী অভিযান এদেশে কালান্তরের নির্দেশক। সে অভিযান শুধুমাত্র একটি সামরিক কিংবা রাজনৈতিক ঘটনাতেই পরিসমাপ্তি হয়নি — প্রথমে তা দেশব্যাপী সাধারণের জীবনেও ব্যাপক রূপান্তরের সূচনা করে। প্রাক্ তুর্কী অভিযানের কাল পর্বে এদেশের মানুষের জীবন যাত্রার যে পরিচয় পাই তখন রাষ্ট্রব্যবস্থায় সর্বনিয়ন্ত্রা সামন্ততন্ত্র। এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠতম সহায়ক ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ। ধর্মের নামে, সামাজিক বিধি বিধানের নামে সাধারণ মানুষের জীবনে ব্রাহ্মণের প্রবল প্রতাপ বিরাজ করত। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা

কৌলিন্য প্রথা চালু করেন। অন্য দিকে বাণিজ্য নিয়ে বণিক সম্প্রদায়ের তখন নোতুন উন্মেষ হচ্ছে। সেন রাজত্বের আমলে নরোত্থিত এই বণিক শক্তিকে খর্ব করবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সমাজে তখন সামন্ত - ব্রাহ্মণ্য নেতৃত্বে শ্রেণী বৈষম্য বিস্তার লাভ করেছে। তবে সমাজের ওপর তলায় সামন্ত শ্রেণীতে বণিক শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব হলেও সাধারণের জীবনে সে দ্বন্দ্বের যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল এমন মনে হয় না। তৎকালে সাধারণ বাঙালীর নিরুত্তাপ জীবন - যাত্রা কৃষি প্রধান - গ্রাম কেন্দ্রিক। আর ছিল জেলে, ডোম, বাগদী, মাঝি, এদের যার যার পেশা এবং সেই পেশা কেন্দ্রিক তাদের সমাজ। বিভিন্ন প্রকার ব্রত, পার্বণাদি লোকাচারে আবদ্ধ ছিল সাধারণ সমাজ জীবন।

১২০০ খৃঃ অঃ নাগাদ তুর্কী অভিযানের সাথে এই নিরুত্তাপ সমাজ জীবন বিপুলভাবে নাড়া খায় এবং প্রায় দু'শ বছর ধরে রাষ্ট্রে সমাজ, ধর্মীয় বিশ্বাসে সংস্কারে আলোড়ন ঘটে যায়। এ আলোড়ন কতটা গভীরে অনুপ্রবেশ করেছিল তার স্বাক্ষর পরবর্তীকালীন কয়েক শতাব্দী ব্যাপী বাংলাদেশের জন মানুষের ইতিহাস। তবে সে যাই হোক, তুর্কী বিজয়ের দরুণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘাত সমন্বয়ের অনিবার্য প্রক্রিয়া সকল সংঘটিত হলেও কৃষি প্রধান বাঙালী সমাজের মৌল পরিবর্তন সাধিত হয় নি।

পরবর্তী কাল পর্ব সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত। প্রারম্ভিক পর্বে স্বাধীন বাংলার রাজদণ্ড পাঠানদের হাতে, এবং কতিপয় প্রদেশাঞ্চলে বার ভুঁইয়ার কর্তৃত্বাধিকার। প্রশাসনে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তখন পূর্বতন জায়গীরদারী প্রথা, সামন্ত প্রভুত্ব অব্যাহত রয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে একদিকে সূফী - দরবেশদের কল্যাণে ইসলামের প্রভাব বলয় ক্রমে বিস্তার লাভ করছে, অপরদিকে নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব

মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশ। একালে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের ধর্ম হিন্দু মানসকে বিস্ময়কর ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

আবার বিদেশাগত মুসলিম অভিযানের কিছু কাল পর থেকেই দেশীয় মানসে হিন্দু - মুসলমান ধর্মীয় ভাবনা, সমাজ - আচরণ ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক গ্রহণ - বর্জন - সমন্বয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তখন বিভিন্ন রাজদরবারের (হুসেন শাহ - পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ - রোসাঙ্গ রাজ) পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু মুসলমান সমভাবে কাব্যরস আস্বাদন করবার সুযোগ পাচ্ছে।

ষোড়শ - সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে মোগল বিজয়ের সাথে বাংলার দিগন্ত বহির্ভবনের নিকট উন্মোচিত হল। তারপর থেকে ইংরাজ শক্তির প্রভাব বিস্তারের সময় পর্যন্ত মধ্যবর্তী কালে এদেশের জীবনে নবতর রূপান্তর সংঘটিত হয়। এ সময়ে ভূমি ব্যবস্থায় একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার মোগল রাজপ্রতিনিধি তোডরমল্ল কর্তৃক নোতুন জমার বন্দোবস্ত প্রবর্তন। ফলে দেশে এক নোতুন ভূম্যধিকারী সামন্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। অপর পক্ষে এই কালে বিদেশী বণিকের আনা-গোনা বৃদ্ধি পায় — তার দরুণ নানান দেশের সাথে বাণিজ্যিক সেতু-বন্ধন স্থাপিত হয়। সমাজ জীবনে সওদাগর শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধির সাথে স্বভাবতঃই তার কিছুটা প্রভাব এসে পড়ে পুরাতন দৃষ্টি ভঙ্গীর ওপর। দেশের নানা কেন্দ্রে ক্রমে গড়ে উঠতে থাকে শহর - বন্দর - গঞ্জ। এবং এক ধরণের দরবারী সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি শহরকে কেন্দ্র করে। তবে বলা দরকার, এ সমস্ত কিছু সমাজের প্রত্যক্ষগোচর উপরি অংশের ব্যাপার। সমাজ গভীরে তার তেমন প্রতিক্রিয়া ছিল না, এবং ব্যাপকতর ক্ষেত্রে গ্রামীন জীবনাচরণ, গ্রামীন সংস্কৃতির ধারা সেই সনাতনের খাত বেয়েই প্রবহমান ছিল। অধিকাংশের জীবনের জন্যই সত্য ছিল মধ্যযুগীয় আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার - কুসংস্কার।

অষ্টাদশ - ঊনবিংশ শতাব্দী নাগাদ সাংস্কৃতিক চেতনায় আধুনিকত্বের পদধ্বনি শ্রুত হতে থাকল। তবে অবশ্যই তা নোতুন নগরী, কলকাতায়, এবং কলকাতা ও ইংরিজি কেতায় সদ্য গড়ে ওঠা উচ্চবিত্ত - নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে। এই শ্রেণী নগরকেন্দ্রিক, পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত এবং ইংরাজ প্রশাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপরে নির্ভরশীল। একই সাথে আমরা পুনরায় লক্ষ্য করব, দেশের ব্যাপক গ্রামীন জনপদে মধ্যযুগের অনুসৃতিতে লোক সংস্কৃতির ধারাও অব্যাহত গতিতে প্রবহমান।

১৯৪৭ পর্যন্ত বিদেশী প্রশাসনের প্রভাবাধীন কালে এই ভাবে দুই সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে আমরা মানুষ হয়েছি। আমাদের অধিকাংশের জীবনের শিকড় প্রোথিত গ্রামের মাটিতে — নোতুন শিক্ষা এবং পেশা আমাদের একাংশকে শহর - বন্দর - নগরবাসী করেছে। বাংলা-দেশের মানুষের জীবনাচরণের মূল বৈশিষ্ট্য এখানে নিহিত।

আমরা জানি বিচিত্র উপকরণে গঠিত মানুষের সংস্কৃতি। এই সকল উপকরণের মধ্যে প্রধানতঃ উল্লেখ্য : ক. বিশেষ জনপদের ভূগোল - প্রকৃতি, খ. সেই বিশেষ জনগোষ্ঠীর উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনের বন্টন ব্যবস্থা, এবং গ. তার মানস ভাবনা - বিশ্বাস, সংস্কার, ধর্মচেতনা। এই সকল উপকরণের অবদানেই ত' গড়ে ওঠে মানুষের জীবন। অতএব সব মিলিয়েই তার সংস্কৃতি। বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ অনুসন্ধান কর্মে এ বিষয়ে সচেতন থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে চাইছি। প্রাচীন কালাবধি বাংলাদেশের মাটিতে কদাপি কোনো বিশেষ ধর্ম বিশ্বাস দীর্ঘ দিন যাবৎ মূল এবং বিশুদ্ধ আকারে স্থায়ী হয় নি। (কোনো

দেশেই তা সম্ভব নয়। মহাকালের প্রভাবে তার চেহারা পাল্টায়)। এ কারণে জিজ্ঞাস্য — বিচ্ছিন্ন হিন্দু সংস্কৃতি, কিংবা বিচ্ছিন্ন মুসলিম সংস্কৃতি, অথবা তদর্থে বিচ্ছিন্ন কোনো বিশেষ ধর্মীয় সংস্কৃতি এদেশের জন মানুষের জীবনে কতটা বিরাজমান? কত স্পষ্ট রেখায় তা চিহ্নিতকরণ সম্ভব? বরং তিন হাজার বৎসরের বাংলাদেশের ইতিহাসে ত' দেশীয় মানস, লোকজ সংস্কারকেই শেষ অবধি জয়ী হতে দেখি। এ জন্যে এদেশে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মতবাদ স্থায়ী হয় নি। নির্ভেজাল ব্রাহ্মণ্যবাদ জয়ী হয় নি। অবিকৃত, মূল ইসলাম ব্যাপকতা লাভ করে নি। এর প্রমাণ রয়েছে হাজার বৎসরের বাংলা সাহিত্যে, বাংলা গানে। গীতিকা-গাথা সাহিত্যে যে জীবনের পরিচয় পাই মূলতঃ তা লোকজীবন। লোকায়ত প্রেমের কাহিনী এ সাহিত্যে বিধৃত। কীর্তন-বাউল-মারফতী গানেরও অন্তর্নিহিত তত্ত্বটুকু হচ্ছে শুদ্ধ মানব-সত্যের কথা। অসল বাংলা সাহিত্যে, গানে যা পাই তা হচ্ছে সমন্বয়ের বলিষ্ঠ জীবনবোধ, লোক জীবনের মূল প্রাণকেন্দ্র থেকে তা উৎসারিত।

বাংলাদেশের মানুষের স্বাভাবিক আত্মীয়তা এই সংস্কৃতির সাথে। কেননা আমরা ত' কাল-বিচ্ছিন্ন নই, প্রবাহ-বিচ্ছিন্ন নই। অতএব আবহমানকাল ধরে প্রবহমান যে সংস্কৃতি ধারা, বহু বিচিত্র প্রভাব এবং প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দেশের মাটির আপন পরিবেশে লালিত ও পরিপুষ্ট যে বিশেষ সংস্কৃতি — সমস্ত কিছুকেই মিলিয়ে নিয়ে সেই যে ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ জঙ্গম সংস্কৃতি, আজকের বাংলাদেশের মানুষের তাতে সহজ উত্তরাধিকার।

তথ্য নির্দেশ

১. উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে অবশ্য 'বঙ্গ', 'বঙ্গবাণী', 'দেশী ভাষা' এই জাতীয় পরিচয় বাচক শব্দাবলীর প্রয়োগ রয়েছে। তবে এগুলি সাধারণভাবে ব্যবহৃত। আধুনিক সচেতনার বিশেষ অর্থবহ ব্যঞ্জনা সেখানে অনুপস্থিত।

২. ডঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'উনিশ শতকে বঙ্গীয় মোসলমান', দৈনিক বাংলা, এক্সপে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ১৯৭৭

৩. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, ১৯৭৭, পৃঃ ১৪৫

৪. ঐ ঐ পৃঃ ৩১৩ — ৩১৪

৫. ঐ ঐ পৃঃ ৩১৫

৬ ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ১৯৪৮, পৃঃ ৩

৭. ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, ১৯৫২, পৃঃ ৪৯

৮. ঐ পৃঃ ৬৪

৯. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাগধী নয়, গৌড়ী প্রাকৃত নামক প্রাকৃত থেকে নবীন ভারতীয় আর্য ভাষারূপে বাংলা ভাষার জন্ম।

১০. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ মনে করেন যে, প্রাচীনতম চর্যা আনুমানিক দেড় হাজার বৎসর পূর্বে রচিত।

আলোচনা

ক. আবদুর রহিম :

মুস্তাফা নূরউল ইসলামের প্রবন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। আমি সেগুলো সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করতে চাই। 'বাংলাদেশ — উত্তরাধিকার। বাংলাদেশ বলতে উনি কোন সময়ের বাংলাদেশের কথা বলেছেন? ১৯৭১ এর পূর্বে সাধারণত পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান বলা হোত। ১৯৭১ এর পরে বাংলাদেশ বলা হচ্ছে। এখন মুস্তাফা নূরুল ইসলামের বাংলাদেশ কোন বাংলাদেশ? আর উত্তরাধিকার? ইংরেজী শব্দ যদি আমরা ব্যবহার করি তবে সেটা হবে legacy। বাংলাদেশের legacy নিয়ে যদি কথা বলি, তাহলে বলতে হয় — Bangladesh is a legacy of Muslim culture in Bengal— is a legacy of Muslim culture and Muslim political system and also other things releated to the Muslim rule in Bengal। কারণ আমরা দেখতে পাই যে মুসলমানরা সর্ব প্রথম বাংলাদেশকে একত্রিত করেন, এবং এককেন্দ্রীক শাসনের অধিকারে আনেন। এর পূর্বে বাংলাদেশ বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন উত্তর বঙ্গকে বলা হতো গৌড় বা বরেন্দ্র, দক্ষিণ - পূর্ব বঙ্গকে বলা হতো সমতট, পূর্ব বাংলাকে শুধু বঙ্গ বলা হোত। এমন কি রাজা যাঁরা ছিলেন তাঁরা কখনো নিজেদেরকে বাংলার রাজা বলতেন না, তাঁরা বলতেন গৌড়েশ্বর। কেবল একমাত্র আমরা দেখতে পাই মুসলমান আমলেই সমগ্র বাংলা-

দেশকে geographically একত্রিত করা হয়, এবং বাংলাদেশের নাম দেওয়া হয় 'বাঙ্গালা'। 'বাঙ্গালা' শব্দটা মুসলমানদের দেওয়া। আগে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু ১৮৯১ সালে যখন আদমশুমারি হয় তখন দেখা যায় মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। তারা সংখ্যায় হিন্দুদেরকে ছাড়িয়ে গেছে। এবং এর পরে যখন বঙ্গভঙ্গ করা হলো, বাংলা ভাগ করা হলো, তখন মুসলমানরা কেন এটা সমর্থন করলো আর হিন্দুরা কেন এর বিরোধিতা করলো? ১৯০৫ সালে আমরা দেখতে পাই যে অঞ্চলে মুসলমান কৃষ্টি সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রাধান্য, সেই অঞ্চলটা নিয়ে মুসলমানরা থাকতে চায়। এবং পাকিস্তান আমলেও আমরা দেখতে পাই যে প্রথম পর্বে তারা মুসলমান সংস্কৃতি বজায় রাখার জন্যই ভারত বিভক্ত করে পাকিস্তানের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছিল। এরপর যখন দেখলো যে তারা সমান অংশ পাচ্ছে না তখন পৃথক হয়ে যায়। আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ is a legacy of Muslim culture and Muslim political system in Bengal। অবশ্য এটার মধ্যে আরো অনেক কিছু আছে। বৌদ্ধ সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতি থাকতে পারে, কিন্তু সেটার মধ্যে যার প্রাধান্য সেটা হলো মুসলিম 'কালচার'।

খ. সফিউদ্দিন জোয়ার্দার

প্রফেসর নূরউল ইসলাম সাহেব তাঁর অননুকরণীয় বাচনভঙ্গীর মাধ্যমে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয় উত্থাপন করেছেন। আমি এর উপরে কিছু মন্তব্য করবো। তবে আমি বাংলাদেশের বাইরে একটা দেশ থেকে শুরু করবো এবং পরে আমি সে বক্তব্যকে বাংলাদেশের ভিতরে টেনে নিয়ে আসবো। ১৯৩৮ সালে ইরাকের শিক্ষা বিভাগের

অধিকর্তা শামি শওকত ইরাকের কলেজের ছাত্রদের এক সমাবেশে ভাষণ প্রসঙ্গে একটা মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন। বক্তব্যটা বাংলাতে যা দাঁড়ায় তা হলো, "ইরাকের ইতিহাসকে এতদিন আমরা বিকৃত করেছি, আমরা ইরাকের ইতিহাস শুরু করেছি মুসমানদের ইরাকে আগমন সময় থেকে। কিন্তু ইরাকের ইতিহাস অত নূতন নয়। ইরাকের ইতিহাস শুরু হয়েছে এপিরিয়াসের সময় থেকে, এবং এপিরিয়াস এর বীর যোদ্ধারা শ্রদ্ধেয়, যেমন শ্রদ্ধেয় "হযরত রসুল মামুন।" তিনি বলেছিলেন, "আমাদের ইরাকের ইতিহাস মাত্র তেরশ' বছরের ইতিহাস নয়"। একটু লক্ষ্য করুন এই বক্তব্যের ভেতরে যে প্রশ্নটা দেখা দিয়েছে সেটা আরব দেশেই দেখা দিয়েছিল। সেটা একটি বিশেষ আরব দেশের ইতিহাস — ধরুন মিশর কিংবা ইরাকে, সেটা কি ঠিক ইসলাম যখন এসেছে তখন থেকে শুরু হবে, না তার আগে থেকে? তার আগের যে সভ্যতার চিহ্ন আছে ইতিহাসে সেটা কি একদম বাদ দেবো আমরা? বাদ দেওয়ার পক্ষে অনেকে ছিলেন আরব জগতে। কিন্তু শামি শওকতের মত আর এক নূতন শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হলো তারা বললো, না, বাদ দেওয়া যায় না। একটা দেশের ইতিহাস খণ্ডন করে একটা বিশেষ সময় থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। তার অতীত ইতিহাস অতীত কৃষ্টি অতীত 'কালচার'কে বাদ দেওয়া যায় না। বাংলাদেশকে যদি মনে করি যে ইসলামের আবির্ভাবের সময় থেকেই শুরু হয়েছে তাহলে পাহাড়পুরের যে অপূর্ব সভ্যতার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি সেটা কি আমি আমার নিজের বলে দাবী করবো না? সেটা কি আমার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের একটি অংশ নয়? এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। প্রফেসর ইসলাম বলেছেন, বাঙ্গালী সংস্কৃতি বা বাঙ্গালী সভ্যতা — বহুমাত্রিক, এক-মাত্রিক নয়। বহু রৈখিক, এক রৈখিক নয়। অথবা, সমাজ

বিজ্ঞানীরা যেটা বলে থাকেন open society and close society এবং তার অনুসঙ্গ হিসাবে, open culture ও close culture। তিনি বোধ হয় বলতে চেয়েছেন বাঙ্গালী সংস্কৃতি open culture হবে, close culture নয়। আমি তাঁর সাথে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আর একটা প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে এসে যায় যেটা মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সাহেব উত্থাপন করেন নি। অবশ্য তিনি উত্থাপন করেছেন কিনা জানি না — কেন না তিনি মাঝে মাঝে 'জাম্প' করে গেছেন, তার মধ্যে আছে কিনা জানি না। সেটা হলো, যদিও আমরা বলছি আমাদের বাঙ্গালী সংস্কৃতি বহু মাত্রিক বহু রৈখিক, কিন্তু তবুও আমরা কেন বারবার দেখছি যে তাকে এক মাত্রিক, এক রৈখিক করার চেষ্টা চলছে এবং জোরেসোরেই চলছে; এবং মাঝে মাঝে সেটা সফলতা লাভ করছে, বাস্তবে জয়লাভ করছে। এটা কেন হচ্ছে? আমরা একদিক থেকে বলছি আমাদের সভ্যতাকে সমৃদ্ধিশালী করবার জন্য মানব সভ্যতার সমস্ত কিছু আমরা আহরণ করবো — সেই সময়েই দেখছি ঢাকা জি. পি. ও'র সামনের একটি ভাস্কর্য ভেঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এর পরে যদি আপনারা বলেন আমাদের সংস্কৃতি একেবারে open culture, আমাদের সংস্কৃতি সর্বজনীন, বিশ্বের ভাল সব কিছু আমরা আহরণ করি — এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, কেন এরকম হচ্ছে? এটা একটা vicious dialectic বলতে পারেন। Vicious dialectic এ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে open culture করার যে প্রচেষ্টা অতি শীঘ্র সেটাকে বানচাল করে close culture করবার চেষ্টা হচ্ছে। এটা বারেবারে হচ্ছে। উনিশ শতকের রেনেসা যাকে আমরা বলি বাংলার পুনর্জাগরণ, সেটা যদি আপনারা লক্ষ্য করে থাকেন সেটাতেও আমরা দেখতে পাবো একই ব্যাপার। অল্প কিছু দিনই open culture এর প্রচেষ্টা চলছিল। তারপর সেটাকে close

culture করার প্রচেষ্টা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তরফ থেকে হয়েছিল। Vicious dialectic আবার শুরু হয়েছে। এর কারণ কি সেটা অনুসন্ধান করা দরকার। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সাহেবকে অনুরোধ করবো, তিনি যেন এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করেন। তা না হলে শুধুমাত্র আমাদের সভ্যতা সঙ্কর সভ্যতা এ কথা বলার কোন যৌক্তিকতা থাকবে না। একটা কথা আমি বলতে পারি। যে সভ্যতা — যাকে আমি বারেবারে open culture বলছি, তাকে যদি রক্ষা করতে হয় তবে একটা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে। সেই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ধরণের চিন্তা ভাবনা মানস ও মানসিকতা গড়ে উঠবে। সেটা আমাদের দেশে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। আমি অবাক হয়ে যাই আমরা যখন সংস্কৃতির কথা বলি তখন এর গুরুত্বপূর্ণ দিকটা আমরা বারেবারে অবহেলা করে থাকি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে দ্বৈততার সৃষ্টি হয়েছে সে দ্বৈততার যতদিন না অবসান হবে — আমি বিশ্বাস করিনা চীৎকার করেও আমরা আমাদের 'কালচার'কে open culture করতে পারবো, আমরা সত্যি সত্যি আমাদের সংস্কৃতিকে একটা মানব কল্যাণকামী সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করতে পারবো। সুতরাং এ সব ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার জন্য প্রফেসর মুস্তাফা নূরউল ইসলামকে অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

গ. রফিকুল ইসলাম

যেহেতু আমি একটি প্রবন্ধ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট, সেই কারণে আমি ভেবেছিলাম যে আমার প্রবন্ধটি পাঠ করা ছাড়া আর আমি আমার মুখ উন্মুক্ত করবো না। কিন্তু বাধ্য হলাম। ডঃ রহিম একটি

প্রশ্ন তুলেছেন, বাংলাদেশের legacy কি? প্রফেসর রহিম দীর্ঘদিন করাচীতে ছিলেন। এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তিনি বাংলাদেশে এসেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি এখানে উপস্থিত ছিলেন না। সম্ভবত অনেক ঘটনা, অনেক দৃশ্য ও অনেক সত্য তাঁর অগোচরে থেকে গেছে। সে জন্য আমি তাঁর স্মৃতিকে কিছুটা জাগ্রত করতে চাই। '৪৭ সালে দেশ বিভাগ হয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর জাতির জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বলেছিলেন যে এখন থেকে হিন্দুরা হিন্দু থাকবে না— মুসলমানরা মুসলমান থাকবে না — সবাই পাকিস্তানী থাকবে। তার কারণ, কায়েদে আযমের একটা বাস্তব দৃষ্টি ছিল যে পাকিস্তান একটি জাতি নয়। নৃতাত্ত্বিক ভাষাভিত্তিক অনেকগুলো জাতি অনেকগুলো সংস্কৃতি সেখানে ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে পাকিস্তানী শাসকরা সেই বাস্তব বোধ বর্জিত হবার কারণে আমরা বাংলা ভাষাভাষী বাঙ্গালী জাতি, সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রাম করে আমরা বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছি — এটা আমি ডঃ রহিমকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেখানে কি শ্লোগান ছিল — তিনি যদি জানতে চান, আমি তাহলে বলবো সেখানে শ্লোগান ছিল 'জয় বাংলা', এবং সেখানে আরো ছিল 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ'। যা হোক এসব কথা আজকে খুব মধুর নাও হতে পারে অনেকেরই কাছে। আজকে যারা 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের' কথা বলছেন তাঁরাও কিন্তু ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা বলছেন না প্রত্যক্ষভাবে। তাঁরা বলছেন আমাদের এই যে রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড, তার যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, তার ভিত্তিতে আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যতে। এ কথা তাঁরা বলেছেন। এটা কিন্তু লক্ষ্যণীয়, আমাদের রাষ্ট্র নায়কেরা যাঁরা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা বলছেন তাঁরা কোথাও বলেননি যে এই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হবে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ,

এটা কখনও তাঁরা বলেন নি। তাঁরা বরং এ কথা বলেছেন বাংলাদেশের যে বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁদের ঐতিহ্য তাঁদের উত্তরাধিকার নিয়েই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠবে। সুতরাং যাঁরা ইচ্ছাকৃত ভাবে এই স্পষ্ট বিষয়ের মধ্যে নানারূপ তর্ক - বিতর্ক সৃষ্টি করতে চান — তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ যে অনুগ্রহ পূর্বক দূর ইতিহাসে বিচরণের পূর্বে অতি নিকট ইতিহাসের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করবেন।

ঘ. হাসান আজিজুল হক

প্রফেসর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম যখন তাঁর প্রবন্ধটি পড়ছিলেন, তখন আমি লক্ষ্য করছিলাম, তিন চারটি পৃষ্ঠা তিনি একসঙ্গে বাদ দিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই যতদূর মনে হচ্ছে প্রবন্ধটি আমরা খুব খাপছাড়া ভাবেই শুনতে পেলাম। এটা অবশ্য উনি করতে বাধ্য হলেন, কেননা তাঁর হাতে সময় খুব কম। তবে তামার সান্ত্বনা — এটা নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে আই. বি. এস. - এর পত্রিকায় প্রকাশ হবে, এবং তখন এটাকে আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে দেখতে পাব। তবু বিচ্ছিন্নভাবে ও আংশিকভাবে প্রবন্ধটি তিনি পড়লেও তার মূল কথা আমরা বুঝতে পেরেছি। বিশেষ করে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক, এবং প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে আজকে যখন আমরা নানাভাবে আমাদের পরিচয়কে খণ্ডিত করার চেষ্টা করছি এবং খণ্ডিত অবস্থায় তুলে ধরার চেষ্টা করছি, যখন আমরা চারিদিক থেকে আমাদের চারপাশে একটার পর একটা ধর্মের, সম্প্রদায়ের দেয়াল তুলে ধরছি। তখন আজকে এ কথাটা খুব জোর করে বলবার প্রয়োজন আছে যে আমি বাংলাদেশের মানুষ, আমি বাঙ্গালী। এবং সেই জন্য আবহমানকালের সমগ্র

বাঙ্গালী জাতির যাবতীয় বৈষয়িক, শৈল্পিক, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে আমার অধিকার আছে। এই কথাটাকে এই প্রবন্ধে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তিনি বলেছেন। কিন্তু বলার আগে আমার আজকে মনে পড়ছে গোপাল হালদার এখানে এসেছিলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তাঁর উপাধি হচ্ছে মুখোপাধ্যায়, তিনি গোপাল মুখোপাধ্যায়। তবে তাঁর নিজস্ব কুলের যে উপাধি, সেটি হচ্ছে হালদার। অনেকে ওঁকে বারবার বলেছেন, 'আপনি তো নিজেকে মুখোপাধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন।' উনি বলেছেন, 'আজ্ঞে, আমাকে মাপ করবেন। হালদার বললে আমি এই দেশের অনেক কাছে চলে আসি। এই দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার যে খুব স্পষ্ট যোগাযোগ আছে, আমি সেটা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে পারি। মুখোপাধ্যায় বললে এই যোগাযোগটা ছিন্ন হয়ে যায়। এই জন্য আমি যতদূর পারি নিজেকে হালদার হিসেবে পরিচিত করতে চেষ্টা করি। আমার নাকটা বলছে আমি ঠিক আর্য বংশ সম্ভূত নই। আমার গায়ের রংটা বলছে আমি ঠিক ইউরোপের কোন জাতির কাছ থেকে আসিনি। আমার চেহারা, আমার সমস্ত শরীরের যে ভাষা, তা থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে, এদেশের অসংখ্য জনগোষ্ঠীর যে সংমিশ্রণ ঘটেছে সেখান থেকেই আমারও উৎপত্তি হয়েছে।' কাজেই ডঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বলেছেন, বাঙ্গালী জাতি সঙ্কর জাতি, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি সঙ্কর সংস্কৃতি। এবং অবশ্যই এই সামগ্রিক যে সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে আমরা বসবাস করছি এর কোন অংশকে বিচ্ছিন্ন করা খুবই অন্যায় হবে এবং সম্ভবত নিজের রূপটাকে খণ্ডিত করা হবে। যে কথাটা দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম, আজকে এই কথাটা বলবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী আছে। আজকে একটা সংশয় মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের গ্রহণ করতে হবে। একটা সামগ্রিক

দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের আজকে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আমরা নিশ্চয়ই বিশ্লেষণ করবো। সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে। আজকে আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে আমরা বিভিন্ন কাল পর্যায়ে ভাগ করার চেষ্টা করছি। আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীকে আরো স্পষ্ট করে বিচার করার চেষ্টা করছি। আমরা বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করছি সেখানে কী কী উপাদান কাজ করেছে। অর্থাৎ খুবই পরিশ্রমের সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক জগতটাকে আমাদের সামনে খুব সুন্দর করে তুলে ধরা দরকার হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে যে মূল দৃষ্টিভঙ্গী, যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, সেটা আমরা কখনই হারাতে পারি না। আমরা বিশ্লেষণের মধ্যে আবদ্ধ থেকে অংশকে যদি সমগ্র হিসেবে চিহ্নিত করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের নিজেদের পরিচয়কে ক্রমাগত খণ্ডিত করব। তাতে আমাদের কোন উপকার, কোন লাভ হবে না। আজকে তাঁর প্রবন্ধ থেকে এ কথাটা খুব স্পষ্টভাবে উঠেছে বলেই আমি বললাম। তবে এর সঙ্গে আমার একটা বিনীত নিবেদন আছে। সেটুকুই একটা প্রশ্নাকারে তুলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। প্রফেসর নূরউল ইসলাম বলেছেন যে সংস্কৃতি নির্মাণ করা যায় না। এটাও যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি প্রবন্ধটি লিখেছেন, তা থেকে এ কথাটা আমরা অবশ্য বুঝতে পারি। তিনি সংস্কৃতির তুলনা করেছেন প্রবহমান নদীর সাথে। এটা নিত্য বহমান। এটাতে অসংখ্য ধারা এসে মিশেছে, অসংখ্য উপাদান এসে মিশেছে। এবং এর প্রকৃতি মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে অক্ষুন্ন ভাবে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে। এটাকে কোন একটা জায়গায় গিয়ে স্তব্ধ করে দেওয়া চলে না। সেই অর্থে তাকে নির্মাণও করা যায় না। কথাটি সত্যি। কিন্তু খুব চূড়ান্ত ভাবে কি? এখানে আমার একটু সংশয় রয়ে গেছে। কারণ আমরা সংস্কৃতি যেমন খুশী নির্মাণ করতে পারি না।

একটা চেয়ার যেভাবে, কিংবা একটা বাড়ী যেভাবে নির্মাণ করতে পারি সেভাবে সংস্কৃতিকে কখনও নির্মাণ করতে পারি না — সত্যি কথা। কিন্তু আমরা কখনও কখনও বলতে পারি যে আমাদের সংস্কৃতিতে গ্লানি ঢুকেছে — আমাদের সংস্কৃতিতে কলুষ ঢুকেছে, আমাদের সংস্কৃতিতে বিকৃতি প্রবেশ করেছে, অর্থাৎ ব্যাধি প্রবেশ করেছে। কিন্তু ব্যাধির কথা যদি আমরা বলি তাহলে ব্যাধির নিরাময়ের কথাও আমাদের বলতে হয়। আমরা যখন সামগ্রিক ভাবে সংস্কৃতির কথা বলি তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে, বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে কখনও প্রচণ্ড বিস্ফোরণ দেখতে পাই। কখনও সেখানে সাংঘাতিক মন্থরতা এবং বন্ধ্যাত্ব দেখতে পাই। তাহলে সেটা কেন হয়? একটা দেশের একটি জাতির সংস্কৃতিতে এই যে উন্নতি এবং অবনতি, এই সমস্ত জিনিষ-গুলি যখন ঘটছে, তখন কি আমাদের কোথাও সক্রিয়ভাবে কোন কিছু করণীয় নেই? আজকে যখন আমরা বলি আমাদের চলচ্চিত্রে, আধুনিক গানে, আমাদের দেশের সাধারণভাবে সংস্কৃতিতে নানা বিকৃত অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে, ভিতর থেকে ব্যাধি এসে আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে — এ কথা যখনই বলি তখন নিশ্চয়ই এর নিরাময়ের কথাটাও — এই ব্যাধি থেকে কি করে রক্ষা পাওয়া যায়, সে কথাটাও আমরা চিন্তা করি। সে কথাটাও আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলতে চাই, এবং এখানেই মনে হয় যে সচেতন প্রয়াসের এবং নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণেরও অবকাশ থেকে যায়। তা করতে গেলেই আমাদের বুঝতে হয় সংস্কৃতি জিনিষটি সত্যিকারভাবে কি? সেটি কি উপরি কাঠামোর ব্যাপার, না সেটা কি স্বয়ম্ভু এবং নিজেই একটি চূড়ান্ত বিষয়? নাকি তার কিছু ভিত্তি আছে, যদি সংস্কৃতিকে আমরা একটা উপরি কাঠামো বলি, যদি তার একটা ভিত্তির কথা আমরা স্বীকার করি — যে ভিত্তির উপর সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে

অবশ্যই এই ভিত্তির কোন পরিবর্তন আনলে এবং সেটা মানুষের চেষ্টার দ্বারা আমরা করতে পারি, তাহলে এই ভিত্তিই শেষ পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির সমগ্র চেহারাটাকে পরিবর্তন করতে পারে। কাজেই যদি সম্পূর্ণভাবে বলে দেই, আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি আমার, তাহলে বহু ক্ষেত্রেই এই বাংলাদেশের বহু বঞ্চনা, এই দুর্ভাগ্যের অংশীদার কিন্তু আমাদের হতে হবে। আমি যদি বলি যে বাঙ্গালী জাতি, বাংলা দেশের সমগ্র মানুষের সংস্কৃতি যা আছে তাই থাকুক, বা আমি সেখানে কিছুই করবো না, তাহলে বোধ হয় গ্রামের পচা পাঁক, গ্রামের অন্ধকার, গ্রামের রোগ, হতাশা থেকে উদ্ভূত যে ক্লিষ্ট সংস্কৃতি আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি এ সংস্কৃতিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করার একটা ব্যাপার দেখা দেয়। কিন্তু আমরা তা বলি না। আমরা বলি যে আমাদের সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিকাশ করতে হবে। বাঙ্গালী জাতি যা হতে পারে, বা তার যা সম্ভাবনা আছে, এই সম্ভাবনা এবং তার এই হতে পারার ক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলতে হবে। তা যদি করতে হয় তাহলে অবশ্যই যে ভিত্তির উপর বাংলা দেশের সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে আমাদের হাত দিতেই হবে। কাজেই এই প্রসঙ্গটি আমি সবিনয়ে প্রফেসর মুস্তাফা নূরউল ইসলামের কাছে বলছি। এ কথাটিও একই সঙ্গে বলতে চাই — চেয়ার টেবিল বাড়ী ঘরের মত সংস্কৃতি, পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে একটা বিশেষ সময় নিয়ে তৈরী করা যায় না।

৬. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

আমি প্রবন্ধ পাঠের আগেই বলেছিলাম, আমি খুব বিপদজনক

এলাকায় পা দিচ্ছি। কথাটা সত্য বলে প্রমাণিত হলো। কতকগুলি প্রশ্ন উঠেছে। সময় একেবারেই নেই এবং এগুলো নিয়ে সারারাত আলোচনা করা যেতে পারে। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় আমার হাতে নেই। আমি কতকগুলি প্রশ্ন তুলে আমার কথা শেষ করবো। ডঃ জোয়ার্দার ইরাকের একটা উদাহরণ দিয়েছেন। এর সঙ্গে আমি একটু যোগ করি, ইরাণের কথাটা। বছর কয়েক আগে তারা আড়াই হাজার বছর আগের — ইরাণের শাহ্ সেটা করেছেন। যে শাহনামা নিয়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে আছে, সেই শাহনামা যিনি রচনা করেছেন, তিনি ঈমানদার মুসলমান, কিন্তু অগ্নি উপাসকদের কথা বলে, এবং তাদের গৌরবময় অতীতকে উজ্জ্বল করেছেন। অন্য একটি মুসলমান রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার বিমানের যে প্রতীক, সেটা হচ্ছে গরুড়। আর আমরা? বাংলাদেশে আপনারা দেখেছেন জয়নুল আবেদীনের Painting নিয়ে আমরা সমগ্র বিশ্বে নাম করতে চাই, কিন্তু আরব দেশে যখন আমাদের কোন রাষ্ট্রদূত যান, — আমি দিন কয়েক আগের কথা বলছি, — তখন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে কথা হচ্ছিল, আমাদের একজন রাষ্ট্র দূত যাবেন, presentation নিয়ে যেতে হবে। এমন একটা ছবি দেবেন, যার মধ্যে মানুষ - টানুষ নেই। এটা মোনাফেকী ছাড়া আর কি হতে পারে, আমি বুঝতে পারি না। একটা প্রশ্ন, ডঃ জোয়ার্দার বলেছেন, যে এক রৈখিক করবার চেষ্টা হচ্ছে, তার কারণ কী তিনি বিশ্লেষণ করতে বলেছেন। এটা এই প্রবন্ধের এলাকায় পড়ে না। এটা অন্য কারো প্রবন্ধে হবে। এই প্রবন্ধে আমি কোন জায়গায় সেটা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি নি। তবে একটা কথা বলতে চাই, এক রৈখিক করবার চেষ্টা শুধু আমাদের দেশে নয়, অন্যান্য দেশেও এ ধরণের চেষ্টা হচ্ছে। এটা হবার পরেও এটা 'গায়েবী ইসলাম' তো বটেই — আলপনা আঁকাটা গায়েবী

ইসলামই বটে। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পী কামরুল হাসান সাহেব আজকে এখানে এলে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। কামরুল সাহেবই বলেছেন, 'আলপনা জিনিষটিকে মন্দির থেকে আমরা পথে এনেছি, শহীদ মিনারে নিয়ে এসেছি।' শহীদ মিনারে যাওয়াটা যদি ইসলামের বিচারে আনা হয় — আমি ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানিনা — এবং সেখানে যেয়ে মালাদান করা হয়, এবং রাষ্ট্রীয় উৎসাহে, রাষ্ট্রীয় উদ্দীপনায়, রাষ্ট্রীয় initiative এ যদি সেটা করা হয়, তবে সেটা কতটা ইসলামী — সেটা আমার পক্ষে বলা মুশকিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন মুসলমানরা সমর্থন করেছিল। হিন্দুরা এর বিরোধিতা করেছিল, কথাটা বোধ হয় সর্বাংশে সত্য নয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মুসলমান সমর্থন ছিল, মুসলমান বিরোধিতাও ছিল। এটা অন্য কারণে। একমাত্র কারণ ইসলাম ধর্ম নয় — রুটি রোজগারের কারণে। পোর্ট কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে এলে কতটা সুবিধা হয় এবং এদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের চাকরীটা কত বাড়ে — সে জন্যই এটা করা হয়েছিল। তারপরের দিকে দেখা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু শিক্ষকের সংখ্যাই বেশী ছিল। Bangladesh is a legacy of Muslim culture in Bengal, এই কথাটা অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। মুসলমানরা সর্বপ্রথম এই অঞ্চলকে এক কেন্দ্রে পরিণত করেন, বা এর সব কিছুই মুসলমানের দান ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইতিহাসের ছাত্র এবং অধ্যাপক যাঁরা আছেন তাঁরা বিচার করুন এটা মুসলমানে দান, পাঠানোর দান, না মোগলের দান। যাদের রাষ্ট্রীয় ছাপ মোগল এবং পাঠান তাঁরা এটা করেছেন। এর সঙ্গে মুসলমান জনসাধারণের কতটা যোগ আছে? উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান বলে আমরা একেবারে আকুলি বিকুলি করি। আব্দুল লতিফের কথা বলি।

আব্দুল লতিফের সাথে সাধারণ মুসলমানের যোগ কতটা? হিন্দু মাত্র ছিল না। আমীর আলীর সাথে কতটা ছিল? মুসলিম কালচার' — এই যে বলা হয় কলকাতা - কেন্দ্রিক 'মুসলিম কালচার' — তার সাথে মুসলমান জনসাধারণের যোগ কতটা আছে? কোন সময়ের বাংলাদেশ? এই একটি প্রশ্ন ডঃ রহিম তুলেছেন। এই প্রবন্ধের বক্তব্য যেটা — যে বাংলাদেশের উত্তরাধিকারের কথা বলা হয়েছে, সে বাংলাদেশ ১৯৭১ এ ভৌগলিক রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক হিসাবে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত যে বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশের কথা আমি এখানে বলছি। এবং এই কথা আমি এখানে বলেছি যে এই বাংলাদেশের উত্তরাধিকার সমগ্র বাংলাদেশের উত্তরাধিকার যার ব্যাখ্যা আমি আগে দিয়েছি। তাই যদি না হয়, তাহলে নজরুল ইসলামকে নিয়ে আমরা মাতামাতি কেন করি? নজরুল ইসলামের চাইতে বেশী দাম আমাদের দিতে হবে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে। তাতো আমরা দেইনা। রবীন্দ্রনাথের বাপের বাড়ীর ঠিকানা যদি নেওয়া হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথ এই বাংলাদেশে পড়েন না। অথচ রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলামের কথা আমরা সেইভাবে বলি না। জীবনানন্দ দাশ তো বরিশালের কবি। এইভাবে ভূগোল ব্যাখ্যা চলে না। অবশ্যই আমরা এখনকার বাংলাদেশের কথা বলছি। কিন্তু এই বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে দু'শো বছরের কলকাতার যে 'কালচার' — তার আগে হুগলীর যে 'কালচার', যে সাহিত্য আমরা পেয়েছি। সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়েও আমরা উত্তেজিত হই কেন? কোথাকার লোক সিরাজউদ্দৌলা? তিনি যদি মুর্শিদাবাদের নবাব হয়ে থাকেন — ভৌগলিক ভাবে মুর্শিদাবাদ ভিন্ন দেশ। এবং জাতিগত থেকে, ভাষাগত দিক থেকে সিরাজউদ্দৌলার সাথে এই বাংলাদেশের বাঙ্গালী মুসলমানের কোন যোগাযোগ নেই। অতএব আমার বক্তব্য এই যে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংস্কৃতির এভাবে

ভাগ করা চলে না। অত্যন্ত বুদ্ধিমান জাত, বিবেচক জাত ইরাকীরা, ইরানীরা - আরবরা — যারা ইমরুল কায়েসকে নিয়ে গর্ব করেন ইজিপসিয়ামরা এবং ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান আমরা কি এতই বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম? আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি কি এতই কমে গেল। যে শেষ পর্যন্ত আমরা পুনরায় Bangladesh is a legacy of medaval Muslim culture বলব? এ নিয়ে আর বিতর্ক করার অবকাশ আমাদের নেই। বরং হাসান আজিজুল হক যে কথাটা বলেছেন সেই পরবর্তী অংশের কাজটা করার সময় এখন এসেছে।

চ. আজিজুর রহমান মল্লিক (সভাপতি)

দুটি প্রবন্ধই খুব বিতর্ক মূলক ছিল। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ 'কালচার' নিয়ে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। কতকগুলো বিষয়ে আমি মনে করি, আমার কিছু বলা উচিত। কারণ, আমি ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম এবং এখনও আছি। একটা হলো ডঃ রহিম বলেছেন যে ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ হয়, তখন মুসলমানরা এর পক্ষে ছিলেন আর হিন্দুরা বিপক্ষে ছিলেন। তার আংশিক উত্তর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম দিয়েছেন। আমি এ বিষয়ে কাজ করেছি এবং বিষয়টা আমার জানা আছে। পাকিস্তান আমলে বৎকাশিত History of Freedom movement গ্রন্থে আমার লেখা একটা অধ্যায় ও আছে। তারপর থেকে এ বিষয়ের উপর আরো গবেষণা হয়েছে। একজন পাঞ্জাবী এর উপর Ph. D করেছেন — আর একজন বাঙ্গালী মহিলা ও করেছেন। আমার যেটুকু ধারণা, বঙ্গভঙ্গটা হয়েছিল ধর্মভিত্তিক কারণে নয়। ডঃ রহিম যা বলেছেন তা অত্যন্ত ভুল ধারণা। লর্ড কার্জন যখন বাংলাকে ভাগ করেন, তখন হিন্দু এবং মুসলমান

দুই গোষ্ঠীই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। কারণ সংবাদ পত্র যেটা তখন বেরুত তখন সেটা ওখান থেকেই বেরুত। হাইকোর্ট ওখানেই ছিল। আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত সম্প্রদায়, বাঙ্গালী মুসলমান, তারা ওখানে (কলকাতায়) থাকতেন। জমিদাররাও ওখানে থাকতেন। তাদের স্বার্থে আঘাত যখন লাগলো তারা তখন বঙ্গভঙ্গ চাইলো না। পরবর্তীকালে লর্ড কার্জন যখন দেখলেন তাঁর এই Partition টা কার্যকরী হচ্ছে না, তখন ময়মনসিংহে এক বক্তৃতা দিলেন। সেখানে বললেন, এই Partition টার রদবদল করা হবে। এমনভাবে করা হবে যাতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এখানে হয়। তাহলে তারা সুযোগ সুবিধা পাবে। মোগল আমলে যা পায়নি। এই টোপটা দেওয়া হলো, তার ফলে মুসলমানরা ঘুরে গেল। নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ এটাকে ভিত্তি করে দেশময় সভা সমিতি করতে লাগলেন। এর ফলে মুসলমানরা ভাবলো, বঙ্গভঙ্গ হলে তাদের সুবিধা হবে। এ সুবিধা ধর্মের নয়, কৃষ্টির নয়। এই সুবিধা হলো শিক্ষা বিস্তার চাকরীবাকরীর সুযোগ সুবিধা এবং আর্থিক উন্নতি। এবং তার প্রামাণ্য উপাদান — ১৯০৫ থেকে ১৯১১ — এই ছয় বছরে পূর্ববাংলার লোকেরা, বিশেষ করে মুসলমানরা অনেক অগ্রসর হয়েছিল। রাস্তাঘাট, চিটাগাং বন্দর, শিক্ষাদীক্ষা চাকরীবাকরী সমস্ত ক্ষেত্রেই মুসলমানরা প্রাধান্য পেয়ে গিয়েছিল এবং actually সেই portion টাই যা ছিল তার একমাত্র আসামটা বাদ দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে। Pakistan movement সম্পর্কে ডঃ রহিম বলেছেন এটা তাঁরা চেয়েছিলেন। আমি উত্তর দেব — মুসলমানরা চেয়েছিল দুটো পাকিস্তান। একটি হলো পশ্চিম ভারতে আর একটি উত্তর ভারতে। খেয়াল করলে দেখবেন, বাঙ্গালী মুসলমানরা মুসলিম লীগের মাধ্যমে যখন পাকিস্তান চাইলেন তাদের conception ছিল North Eastern India East

Pakistan হবে, এবং এই পাকিস্তানের মধ্যে দেখবেন, regionally কেবল বাংলাদেশ নয়, আসামও থাকবে, কলকাতা থাকবে, সম্পূর্ণ বাংলা থাকবে। এটা নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল। আমরা তখন ছাত্র ছিলাম, আমরা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম। তারপর যখন র‍্যাডক্লিফ Award দিলেন, জিন্নাহ্ সাহেব মেনে নিলেন খণ্ডিত পাকিস্তান। বাংলাকে দুই ভাগ করা হলো। পাঞ্জাব দুই ভাগ করা হলো। সুতরাং এটা in the state of partition spirit এর মাধ্যমেই হয়েছে, এটা কেউ করতে পারেনি। It is a result of state of proces ; Pakistan of 1947 was a result of a state of process, action and reaction between Islam and India.

এ কাজ করতে গিয়ে দেখা গেল আমরা একটা মার খেয়ে গেলাম। মার খেয়ে মারটা হজম করলাম। হজম করলাম এই ভেবে যে বোধ হয় এর মধ্যে আমাদের একটা ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু হলো না। ভুল বুঝতে পেরে আমরা আবার বাংলাদেশের আন্দোলন করলাম। সুতরাং এটা বলা ঠিক হবে না যে ধর্মীয় কারণে কৃষ্টির কারণে আমরা Sovereignty চেয়েছিলাম। ধর্মীয় কারণই যদি রাষ্ট্র সৃষ্টির ভিত্তি হয়, তাহলে সমস্ত মধ্য প্রাচ্য এক রাষ্ট্র হতে পারতো। ধর্ম এক, ভাষা এক — তবু তারা এক রাষ্ট্র কেন হতে পারছে না? সুতরাং কোনো রাষ্ট্র ধর্মভিত্তিক হবে — এই conception নিয়ে চললে মার খেতেই হবে। সুতরাং economic reason আসলে fundamental reason, তাই একটা রাষ্ট্র গঠনের পেছনে বিদ্যমান থাকে। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ব্যবহার করেছেন। ধর্ম সেখানে একমাত্র কারণ ছিল না। তাই যদি হতো তাহলে আমরা যখন পাকিস্তান আন্দোলন কালে বুঝতে

পারলাম, এইটুকু নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান হবে — আমার সন্দেহ হয়, কতগুলো শিক্ষিত মুসলমান এতে যোগ দিত না। আমরা বুঝতে পারিনি, বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলমানরা পাকিস্তান চেয়েছিল নিজের স্বার্থে। এটা একরকম বুর্জোয়া মানসিকতার কারণেই হয়েছে……।

যা হোক legacy এর প্রশ্নে আমার মনে হয় এ দেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে ইসলাম ধর্মের legacy বলে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত হবে না। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যে সমস্ত মানুষ এ দেশের অধিবাসী, আবহমানকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তারা উত্তরাধিকারী। বিষয়টি বিস্তৃত, এবং জটিল। সম্ভব হলে এর উপর আর একটা সেমিনার করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আই. বি. এস. কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি ইতি টানছি। ধন্যবাদ।*

* প্রথম প্রবন্ধরূপে তালিকাভুক্ত এবং এই গ্রন্থে প্রকাশিত হলেও এই প্রবন্ধ এবং আলোচনা সমূহের আগে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পঠিত ও আলোচিত হয়। — সম্পাদক।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রসঙ্গে

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় আমাদের যত আগ্রহ — যত আয়োজন, সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার বা অনুধাবন করবার বেলায় আমাদের তত আগ্রহ বা উৎসাহ নেই। এর কারণও অবশ্যি আছে, কেননা রাজনৈতিক ইতিহাস আমাদের অস্তিত্বের ইতিহাস। রাষ্ট্রীয় উত্থান পতনে আমাদের জীবন ও জীবিকার তারতম্য ঘটে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের হেরফের ঘটে। তথাপি রাজনীতি হচ্ছে বাইরের জীবনের আর সংস্কৃতি হচ্ছে অন্তরের অভিব্যক্তি। সংস্কৃতির সংগে যোগ রয়েছে মন ও মননের। রাজনৈতিক জীবন ও অবস্থা যেমন দেশের জন্য ও ব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সাংস্কৃতিক জীবনও ব্যক্তির জন্য তথা দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রীয় জীবনের ইতিহাসের উত্থান পতনের সঙ্গে একদা সাধারণ মানুষের যোগ কিন্তু সামান্যই ছিল। কালক্রমে আমরা দেশ রাষ্ট্র ও তার শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছি। ইদানীং দেশের বৃহত্তম অথবা ক্ষুদ্রতম রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গেও দেশের অতি সাধারণ একজন ব্যক্তিরও সম্পর্ক থাকে, শুধু যে সে খবরাখবর রাখে তা নয় — নিজেরাও কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ধরা যাক বাংলাদেশের ইতিহাসের কথাই। আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম কি ভাবে হয়েছে, এদেশের বহু মানুষের সে ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে।

আজকের বাংলাদেশের জন্ম মাত্র সাত বছর আগে হলেও এই বাংলাদেশের একটি অতীত ইতিহাস রয়েছে — সে কম করে হলেও সাত দ্বিগুণে চৌদ্দ শত বৎসরের উপর। অন্ততঃ চৌদ্দ শত পনর শত বৎসরের লিখিত চিহ্ন পাওয়া যায় এ বাংলাদেশের। এই গেল রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা। অন্যদিকে সংস্কৃতির ইতিহাসের উপাদান সহজলভ্য নয় বলেই আমরা রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে তৎপর হই। রাজকার্যে ব্যবহৃত দলিল দস্তাবেজ তাম্রশাসন, ভূমিদান পত্র, রাজকর্মচারীর লিখিত বিবরণও আমরা রাজনৈতিক ইতিহাস নির্মাণে ব্যবহার করে থাকি। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আদি উপাদানগুলি এত সহজলভ্য নয় বলেই সে ইতিহাসের খোঁজ খবর করা যথেষ্ট কঠিন।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসকে মোটামুটি চার পাঁচটি যুগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এক হিন্দু যুগ, দুই বৌদ্ধ যুগ, তিন হিন্দু যুগ, চার মুসলিম যুগ, পাঁচ ইংরেজ যুগ।

হিন্দু যুগের স্থিতিকাল হচ্ছে চতুর্থ শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত। তখন গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকাল। তখনকার প্রাপ্ত সাহিত্য গ্রন্থ হচ্ছে "আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প"। আর পাওয়া যায় বৌদ্ধ ইতিহাসের গল্প। এই গ্রন্থে উল্লিখিত সোম আর শশাঙ্ক একই ব্যক্তি।[১] তৎকালে গৌড় ও বঙ্গ এ দুটি নামেই বাংলাদেশ পরিচিত ছিল। হুয়েন সাঙের বিবরণে রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক বৌদ্ধ নির্যাতনের সংবাদ পাওয়া যায়। আবার ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গোপাল কর্তৃক পাল বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পাল বংশের শাসকেরা প্রায় চারশত বৎসর এদেশ শাসন করেন। গোপালের বংশধরেরা সবাই বৌদ্ধ ছিলেন। গৌড়ের সর্বশেষ পাল রাজা হলেন

গোবিন্দপাল — তিনি ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।[২] তারপর রাঢ়ে সেন বংশের আধিপত্য শুরু হয় সামন্ত সেন কর্তৃক। সেন বংশের প্রসিদ্ধ শাসনকর্তা বল্লাল সেন হিন্দু সমাজের সংস্কার কল্পে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। লক্ষ্মণসেনের আমলেই মুসলমানেরা এদেশে আসে, যদিও লক্ষ্মণসেনের বংশধর কেশব সেন ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। মুসলিম বিজয়ের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস মোটামুটি এরূপ। আর সেকালের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চেহারাটা কেমন ছিল সে সম্পর্কে খুব বিস্তারিত বলা কষ্টসাধ্য।

কোন জাতির সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র শুধু তার সাহিত্য বা শিল্পের (Painting) মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় — সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত। তার মধ্যে তার পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্য গ্রহণ, ধর্মীয় আনন্দ উৎসব, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য সব কিছুই পড়ে। সংস্কৃতির অর্থ হচ্ছে মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করে তা-ই তার সংস্কৃতি।[৩] সামাজিক জীবনের প্যাটার্ণ তার অর্থনৈতিক জীবনের বিশেষ বিন্যাসে সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিরূপ হিসাবে গণ্য হয়। বাঙলাদেশের সমাজ জীবন আবার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—এক শহরে জীবন বা নাগরিক জীবন, দুই গ্রামীন জীবন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ দুয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট। যদিও অর্থনৈতিক জীবনের প্রভাব বা তাৎপর্য আমাদের আলোচনা বহির্ভূত তথাপি অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সংস্কৃতির বিকাশ ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতিরও যোগ রয়েছে।

হিন্দু বা বৌদ্ধ যুগের যে সংস্কৃতি তার প্রকাশ রয়েছে কিছু সংখ্যক সাহিত্য গ্রন্থের মধ্যে, কিছু প্রস্তর মূর্তির মধ্যে, কিছু স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে। আর এ যুগের সাহিত্য হচ্ছে অধিকাংশ সংস্কৃত। বাংলার আদি সাহিত্যিক নিদর্শন 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ের' মধ্যেও

বৌদ্ধ তান্ত্রিক জীবনের রীতি নীতির ছাপ সুস্পষ্ট। অর্থাৎ সে যুগের সাহিত্য ছিল ধর্মভিত্তিক। তা বৌদ্ধদের চর্যা গানই হোক বৈষ্ণবদের 'গীত গোবিন্দই' হোক। ধর্মভিত্তি করেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির গোড়ার ইতিহাস অনুসন্ধান করলেও আমরা দেখতে পাই যে ধর্ম হচ্ছে সংস্কৃতির একটি বড় উপাদান।

বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কতগুলি বিশেষ রীতি নীতি জন্মগ্রহণ করে ও বিকাশ লাভ করে। ধর্মীয় ঐক্য থাকা সত্বেও ভূখণ্ডের বিভিন্নতার জন্য সংস্কৃতির তারতম্য দৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ ইউরোপের অনেক দেশেই মোটামুটি খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচলিত থাকলেও জার্মানীর সঙ্গে ইংলণ্ডের, ইংলণ্ডের সঙ্গে ইটালীর সাংস্কৃতিক পার্থক্য অবশ্যই আছে। ভূখণ্ডের বিশেষ অবস্থানের জন্য আবহাওয়ার তারতম্য ঘটে — আবহাওয়ার তারতম্যের জন্য আহার্য বস্তু, পোষাকআশাকের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আবহাওয়া খাদ্যদ্রব্য পোষাক পরিচ্ছদ সব কিছু সম্মিলিত ভাবে মানুষের চরিত্র গঠন করে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে আমরা দেখি যে মুক্ত বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ ধর্মের বন্ধন থেকে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করেছে। ধর্মের স্থান দখল করেছে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও কর্ম, বিজ্ঞান ও বুদ্ধি মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রক রূপে হাজির হয়েছে। দার্শনিক কঁতের প্রত্যক্ষবাদে অবশ্য মানব সভ্যতার তিনটি স্তর নির্দেশ করা হয়েছে। প্রথম স্তর ধর্মের যুগ, তারপর দর্শনের যুগ এবং সব শেষে বিজ্ঞানের যুগ।[৪] মুসলিম বিজয় পর্যন্ত যে হিন্দু - বৌদ্ধ বাংলার পরিচয় আমরা পাই সেখানে ধর্মের প্রাধান্য। বিদ্যাচর্চা মানে ধর্মের চর্চা। স্থাপত্য অর্থ মন্দির গাত্রে দেব দেবীর মূর্তি প্রস্তুত করা — সাহিত্য সঙ্গীত অর্থ ঈশ্বর বা তাঁর কোন দেবতার বা অবতারের স্তুতি বা মাহাত্ম্য বর্ণনা।

মুসলমানেরা ভিন্ন একটি ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রতিনিধি রূপে এদেশে আসে। কিন্তু দেখা গেছে, কালক্রমে মুসলিম জীবন ও হিন্দু - বৌদ্ধ জীবন — দর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। হিন্দু মুসলমানের এক মিলিত বা মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে।

বহিরাগত মুসলমানেরা যে সংস্কৃতির ধারক ছিল তার সঙ্গে এ দেশীয় সংস্কৃতির বড় রকমের পার্থক্য ছিল। এদেশের মুসলমানদের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে অল্প সংখ্যক মুসলমানই বাইরে থেকে এসেছিলেন। অধিকাংশ মুসলিম এতদ্দেশীয় জনগণ থেকে ধর্মান্তরিত।[৫] বহিরাগত মুসলমানেরা এদেশীয় সমাজে মিশে যায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে আর এ দেশের ভাষাকে আয়ত্ব করে। এভাবে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এদেশে একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। এ সংস্কৃতি শুধু মুসলমানী (অর্থাৎ আরবী ইরাণী বা তুর্কী) বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ছিল না, তার মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ উপাদানও বর্তমান ছিল। একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে : যেমন পোষাকের কথা ধরা যাক। বাঙ্গালী মুসলমান নারী চিরকালীন বাঙ্গালী পোষাকই পরেছে — ইরাণী বা আরবী পোষাক ব্যবহার করেনি।

এদেশের মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল তিন কারণে : এক ব্যবসায় সূত্রে, দুই ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে, তিন রাজ্য বিস্তারের আশায়।

সপ্তম অষ্টম শতকের কিছু সংখ্যক আরব ব্যবসায়ী ভারতবর্ষে এসেছিলেন (সিন্ধু প্রদেশ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে) এমন সংবাদ পাওয়া যায়। তবে তাদের প্রভাব সমাজে বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী ছিল তার বিবরণ জানা কঠিন। ধর্ম প্রচারকদের প্রভাব আমরা

লক্ষ্য করি, যার ফলে ইসলাম ধর্ম অবলম্বনকারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম শাসকদের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় নানাভাবে মুসলমানী বা ইসলামী সভ্যতার প্রতিফলন এদেশীয় সমাজে দৃষ্ট হয়। বাংলায় যে সমস্ত মুসলিম শাসক এসেছিলেন তাঁরা কেউ ইরাণী, কেউ তুর্কী ছিলেন। এ শাসকদের সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যেও ইরাণী তুর্কী আরবী হাবসী জাতীয় অধিবাসী ছিলেন। ভৌগলিক ভিন্নতা সত্ত্বেও বাহিরে থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সবাই একই ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাই তাদের মধ্যে মোটামুটি একটা ঐক্য বিদ্যমান ছিল।

এই মুসলিম সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি ঘটে অতি শীঘ্রই। মুসলিম শাসন কালে অর্থনৈতিক সুবিধা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মান্তরিত হয়েছে। অবশ্য শুধু মাত্র ধর্মীয় কারণে এ ধরণের ধর্মান্তর গ্রহণ যে হয়নি তা নয়। হিন্দু ধর্মের বর্ণবাদের কঠিন বিধি নিষেধের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা নিপীড়িত হচ্ছিল — শুধু ধর্মীয় দিক থেকে নয়, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা বঞ্চিত হয় — এ সমস্ত কারণে তারা ইসলাম ধর্মের বিশ্বভ্রাতৃত্বের মধ্যে মুক্তির আস্বাদ পেলো। তবে সে যুগে হিন্দুদের মধ্যেও আবার একটি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল—হিন্দু সম্প্রদায়কে বাঁচাবার জন্য। এ উদ্দেশ্যেই কবীর, গুরু নানক, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা একটা গাল্টা মতবাদ বা হিন্দু ধর্মের চাইতে অনেকটা উদার ভিত্তিক ও প্রগতিশীল মতবাদ প্রচারে ও প্রসারে উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতির একটি বিশেষ রূপ আমাদের চোখে পড়ে। তা হচ্ছে ইরাণীয় স্থাপত্য বা চিত্ররীতির সঙ্গে এদেশীয় স্থাপত্যের পাশাপাশি অবস্থান। মুসলমানের কেল্লাদুর্গ, রাজপ্রাসাদ, মসজিদ একটি বিশেষ রীতিতে নির্মিত

হতে থাকলো। এ দেশীয় রীতি মন্দির গাত্রে মন্দির শীর্ষে বিধৃত হলো। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকেরা রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ কর্মে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। মুসলমান শায়েররা ইসলামের ইতিহাস থেকে উপাদান নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। আবার এদেশীয় উপাদানও তাঁদের কাব্যের বিষয় হয়েছে। মুসলমান সমাজ এদেশীয় বাউল ভাটিয়ালী কীর্তন সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়েছে। অবশ্য লোক সঙ্গীতের মধ্যে ইরাণী গজল বা মরমী সুফীদের কথাও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা মুসলমান ঐতিহ্য ও হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্য থেকে সমভাবে উপাদান সংগ্রহ করেই।

এখানে মুসলমান ঐতিহ্য কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতক এই তিনশত বৎসর মুসলমানরা এদেশে বাস করার দরুণ তারা যে সংস্কৃতির বাহক ছিল তা কতকটা এদেশীয় অর্থাৎ হিন্দু সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে এবং কিয়ৎ পরিমাণে তাদের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল এ কথা সত্য। সামান্য দু'একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা দেখা যায়। ষোড়শ শতকের কবি জৈনুদ্দিনের "রসুল বিজয়" কাব্যে যেখানে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর একটি যুদ্ধ যাত্রার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেখানে দ্রুতগামী একটি অশ্বকে 'গরুড়' এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 'গরুড়' এর উপমা এ স্থলে প্রয়োগ করাটা লক্ষ্য করার মত। 'গরুড়' হচ্ছে পুরাণে বর্ণিত পাখীর রাজা এবং বিষ্ণুর বাহন। উক্ত কাব্যগ্রন্থে আবার 'ভীম' অভিমন্যুরও উল্লেখ রয়েছে। কাব্যের ভণিতায় কবি যে ইউসুফ খানের প্রশস্তি গাইছেন, সেখানেও তাঁর বিভিন্ন গুণের জন্য তাঁকে হরিশ্চন্দ্র, ইন্দ্র, শুক্র, মহেশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[৬]

সে যুগে এতদ্দেশীয় মুসলমান কবিরা শুধুমাত্র মুসলিম ইতিহাস

থেকে যে উপাদান সংগ্রহ করেছেন এমন কোন কথা নয়। আমরা দেখি যে প্রাক ইসলামী যুগের কিংবদন্তী উপখ্যান কাহিনী ফারসী সাহিত্যের মারফৎ (কোথাও বা উর্দু সাহিত্যের) বাঙলা সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। কাজেই মুসলমানেরা মধ্যযুগে যা কিছু লিখেছে তার সবটুকু মুসলিম ঐতিহ্যের পরিচয় জ্ঞাপক তা সত্য নয়। বরং এ কথা বলা যায় যে আরব বা পারস্য বা তৎসন্নিহিত অঞ্চলের সাহিত্যের কোন কোন উপাদান বাঙলা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে বেশ কয়েকজন সাধক দরবেশ ফকীর ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্ম নিয়োগ করেন। এরা ভারতবর্ষের (বাংলাদেশ) বাইরে থেকে এসেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ শেখ জালালউদ্দিন তাবরেযী, যাঁর সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায় 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থে। তাতে দেখা যায় পীর দরবেশ অনেকটা দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন হলায়ুধ মিশ্র নামে একজন অমুসলমান। 'শেক' এর কাহিনী থেকে বুঝা যায় — হিন্দু মানসের উপর মুসলমান প্রভাব সেকালে কিভাবে পড়তে শুরু করেছে।[৭]

তারপর রয়েছে শাহ জালাল মুজররদ ইয়েমন — যিনি শ্রীহট্ট জেলায় তাঁর প্রভাব বিস্তার করেন। আরও একটি নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় — তিনি হলেন শেখ নূরউদ্দীন কুতুবে আলম। তিনি রাজা গণেশের (১৪১৪ - ১৪১৮) আমলে জীবিত ছিলেন। ধর্ম প্রচারকদের কার্যকলাপ সমাজের সাধারণ স্তরেও পরিব্যাপ্ত হয় যার ফলে চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ব্যাপকতা শুরু হয়।[৮] এ প্রসঙ্গে ইরানের সুফীবাদ বাংলায় যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তারও কথা স্মরণ করা উচিৎ। সুফীবাদের প্রভাব ও প্রতিফলন সমাজে ও সাহিত্যে ঘটতে শুরু করে। বৈষ্ণব ধর্মে যেমন

প্রেম ভাবকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং প্রেমিক - প্রেমিকার রূপকে তারা ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হয়। সুফীরাও 'আশেক মাশুক' এই মনোভাবকে প্রাধান্য দিয়ে খোদাকে লাভ করতে চায়।

সে যুগে বাংলার কাব্য সাহিত্যে যে মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রেও এতদ্দেশীয় রীতির সঙ্গে মুসলিম স্থাপত্যের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে মসজিদ বা মন্দিরের নির্মাণ কৌশল — বাইরের নকসা ডিজাইনে তা লক্ষ্য করা যায়। মূর্তি অঙ্কিত বহু প্রস্তর মসজিদের নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে এমনও দেখা যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমান শায়েররা হিন্দু পুরাণ বা বিষয় নিয়ে যেমন কাব্য রচনা করেছেন অনুরূপ হিন্দু কবিও মুসলমানী বিষয় নিয়ে কাব্য লিখেছিলেন। রাধাচরণ গোপ লিখেছিলেন 'ইমামের জঙ্গ' অর্থাৎ কারবালার কাহিনী। হিন্দু দেবদেবীরা মুসলমান কবি শায়েরের হাতে পীরে রূপান্তরিত হয়েছেন। শিবের এক রূপ মানিক পীর, সত্যনারায়ণ রূপান্তরিত হয়েছেন সত্যপীরে, মৎস্যেন্দ্রনাথ মুসলমান কবিদের হাতে হয়েছেন পীর মছন্দালি। বনদুর্গা বা দেবী মঙ্গলচণ্ডী হয়েছেন বনবিবি। দক্ষিণ রায়ের মুসলমানী রূপ হচ্ছে বড় খাঁ গাজী, কালু রায় হলেন মগরপীর, গোরাচাঁদ ঠাকুর হলেন পীর গোরাচাঁদ।[৯] এ সমস্ত কাহিনী কাব্যগুলির ভৌগলিক কোন সীমারেখা নেই। অর্থাৎ এ কাহিনীগুলি মক্কা মদিনা ইরাণ, বাংলাদেশ যে কোন স্থানের পটভূমিকায় রচিত হতে পারে। তবে মুসলিম রচিত এ জাতীয় কাহিনীগুলোতে বাংলার মাটি বাংলার জলবায়ু গাছপালা অরণ্য পশুপাখী উপস্থিত হয়েছে। এ সব কাব্যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবাহ সংঘটিত হয়েছে দেখা যায়। এ জাতীয় কাহিনী থেকে এমন ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে সেকালের সমাজে হিন্দু মুসলমানে বিবাহ প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী

পর্যন্ত হিন্দু মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতির প্রতিফলন বিভিন্নভাবে সাহিত্যে পোষাকে খাদ্যাভ্যাসে দেখা আছে অর্থাৎ সংস্কৃতির একটা মিশ্ররূপ বা সমন্বয় লক্ষ্য করা গেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয় এদেশে। ইংরেজরা মূলতঃ বাণিজ্য ব্যবসার উদ্দেশে এদেশে আগমন করে সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদেশের শাসন ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ শুরু করে — পরিশেষে তারা শাসন কর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন ইংলণ্ডীয় বা ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় হতে থাকে তখন এদেশে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। হিন্দুরা একে একভাবে গ্রহণ করে, অপরদিকে মুসলমানেরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে বিরত থাকে। হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর হয়ে পড়ে। ফলে চাকরীবাকরী অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে যায়। ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে হিন্দু সমাজ ইউরোপীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। বেশ কিছুকাল পরে মুসলমান সমাজও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে।

লক্ষণীয় যে ইউরোপীয় সংস্কৃতি বাঙলার সংস্কৃতিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করার চেষ্টা করেছিল। তাই দেখা যায় উনিশ শতকের বাঙালী ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত হয়েছে। উদাহরণ : বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন; পরবর্তীকালে তরু দত্ত, সরোজিনী নাইডু। সামাজিক রীতিনীতি পোষাক পরিচ্ছদ বা খাদ্যাভ্যাসের কথা বাদই দিলাম।

উনিশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপকতা লাভ করেনি, কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষার্ধে দেখা যায় যে এদেশের

প্রতি জেলায় প্রতি মহকুমায় ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ইংলণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হতে বা সেখানকার উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য বহু ভারতীয় (বাঙালীও) সাগর পাড়ি দিচ্ছে। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই নগণ্য ছিল।[১০] পাশ্চাত্য প্রভাবের একটি দিক ইউরোপীয় শিক্ষা গ্রহণ, আর একটি দিক হচ্ছে দেশের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ কর্তৃক ধর্মান্তর গ্রহণ। খ্রীস্টান মিশনারী সম্প্রদায় খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারে অত্যন্ত কার্যকরী প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর লোকদের সহজেই খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণে প্রলুব্ধ করে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের সমাজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান প্রধানতঃ এই চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য হিন্দু সমাজের মধ্যে বহু শ্রেণী বা বর্ণ বিদ্যমান ছিল। ইংরেজ আমলে উনিশ শতকের বাংলাদেশের একটি প্রধান সমস্যা হলো সাংস্কৃতিক জটিলতা। রাজনীতি, পরাধীনতা শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তা শক্তির খর্বতা কতটা ঘটিয়েছিল তার গাণিতিক পরিমাপ হয়তো সম্ভব নয়, তবে এ কথা সত্য যে সেকালে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অনুকরণ বেশ প্রাধান্য লাভ করে। অশিক্ষিত সমাজেও তার প্রভাব পড়ে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য। (বৌদ্ধদের কথা বলা হচ্ছে না এ জন্য তারা হিন্দুদের সঙ্গে প্রায় একাত্ম হয়ে যায়। আর অতি অল্প ধর্মান্তরিত খ্রীস্টানদের কথা তো বলারই দরকার করে না)। শিক্ষিত বাঙালীর পোষাকপরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস গৃহের আসবাবপত্র সবই ইংরেজের অনুকরণে নির্মিত হতে থাকলো। একটা ব্যাপার অবশ্যই লক্ষণীয় যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে এদেশীয় সমাজ যতটা না গ্রহণ করেছিল, তার চাইতে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিল তার বাইরের রীতি-নীতির দিকে। তাই আমরা দেখি ইংরেজের যুক্তিবাদকে গ্রহণ

করার দিকে বাঙালীর বেশী একটা আগ্রহ দেখা যায় না। তাই বলা চলে যে ইংরেজ আমলে বাঙালী সমাজের রূপরেখা অত্যন্ত বিচিত্র ও বহুমুখী। বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের আলেখ্য বহুবিধ বর্ণে রঞ্জিত। হিন্দু সমাজ আর মুসলমান সমাজ জীবনাচরণের বিচিত্র পথে অগ্রসর হয়েছে। ইংলণ্ডীয় শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু যেমন সে যুগে দৃষ্ট হয়, তেমনি টোলে পড়া টিকিধারী এক ধরণের সংস্কৃত ভাষায় আংশিক অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের দেখা যায়। মুসলমান সমাজেও অনুরূপ মাদ্রাসায় পড়া বিচিত্র বেশধারী মৌলবীদের বিচরণ করতে দেখা যায়। পল্লী অঞ্চলে দেখা যায় অশিক্ষিত কৃষক সমাজ, যাদের পোষাকপরিচ্ছদ আচার ব্যবহার বাকভঙ্গী শিক্ষিত হিন্দু বা মুসলমান থেকে পৃথক। শিক্ষিত কিংবা অর্ধ শিক্ষিত কিংবা অল্প শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের পোষাকের সমন্বয় অদ্ভুত রকমের হয়েছে। ধুতি চাদর হিন্দু মুসলমান উভয়ে পরিধান করেছে — ধুতির সঙ্গে হিন্দু মুসলমান উভয়ে পাশ্চাত্য দেশীয় কোট (জ্যাকেট) পড়েছে। কখন কখন হিন্দুরাও আচকান পাজামা পড়েছে যা মুসলমান সমাজের মধ্যে বহুল প্রচলিত। বাঙালীর পোষাকের ক্ষেত্রে তিনটি সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে বলা যায়। খাদ্য সম্পর্কেও ঐ একই কথা। হিন্দু সমাজের নিষিদ্ধ খাদ্য আর নিষিদ্ধ থাকল না — অনেক কম অনুপাতে হলেও মুসলমান সমাজ সম্পর্কেও ঐ একই কথা।

এ সমস্ত আচার আচরণ থেকে বোধ হয় এমন সিদ্ধান্ত করা চলে যে অনুন্নত দেশসমূহের সাংস্কৃতিক চেতনা রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের উপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক নিশ্চয়তা বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার না থাকার ফলে অনুকর্ষণের ইচ্ছা প্রবল হতে দেখা যায়। অনুকরণ ইচ্ছা থেকেই সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার জন্ম। এই বিভিন্নতা থেকেই

জটিলতার সৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও এ প্রসঙ্গে বলা যায়। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে নয়, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরও সংস্কৃতির বিকাশ নির্ভরশীল। বাংলাদেশ চিরকালের কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর নির্ভরশীল। কৃষিকার্যের সুবিধা অসুবিধার উপর ভিত্তি করে বাঙ্গালীর পোষাকপরিচ্ছদ গৃহনির্মাণ পদ্ধতি খাদ্য অভ্যাস, আর অন্যান্য আচার ব্যবহার, সঙ্গীত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে।

ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিকে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে ধর্মীয় চেতনায় পুনর্জীবিত হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়। অবশ্য শিক্ষিত সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ ধর্মীয় জাগরণ সমর্থন করেনি এটাও ঠিক, বা এই ধর্মীয় চেতনার পুনর্জাগরণের অর্থ হচ্ছে যুক্তি বা আধুনিক বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা। রাজনৈতিক সামাজিক দিক থেকে এর অর্থ হচ্ছে পশ্চাৎগামিতা। ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বিশ শতকের আধুনিক যুগে বাস করেও মধ্যযুগীয় মন ও মানস ভারতবাসী বা বাঙ্গালীর জীবনে ক্রিয়াশীল ছিল।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে এশিয়ার মানচিত্রে। পাকিস্তানের অংশ হিসাবে বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশী অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের কিয়দংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর উভয় রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক ভাবে ইংরেজী বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবগুলোকে বর্জন করার একটা চেষ্টা হয়, কিন্তু কার্যতঃ তা হয় নি। যেমন ঃ এর সরকারী কার্যে ইংরেজী ভাষাই চালু থাকে — দেশীয় ভাষাকে স্বীকৃতি দিলেও কার্যক্ষেত্রে

তা কোথাও হয় নি। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি পর্যন্ত মোটা-মুটি ব্রিটিশ পদ্ধতির অনুকরণে চলতে থাকে। তৃতীয়তঃ সরকারী পোষাক পরিচ্ছদ পর্যন্ত (যেমন সেনাবাহিনী, নৌ, বিমানসহ) পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রস্তুত; চতুর্থতঃ খাদ্য অভ্যাসও পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রস্তুত; পঞ্চমতঃ সাহিত্যেও পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও দর্শনের প্রবেশ; ষষ্ঠতঃ চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত সম্পর্কেও একই কথা। তবে চলচ্চিত্র বেতার টেলিভিশন এগুলি আধুনিক কালের আবিষ্কার। কিন্তু এদেশে বেতার টেলিভিশন সিনেমায় সে সমস্ত অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তার মধ্যে এদেশীয় সংস্কৃতি কতটুকু উপস্থাপিত হয় তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

তারপর স্থাপত্য শিল্পে পাশ্চাত্যের অনুকরণ সরকারী ইমারত ও স্মৃতিস্তম্ভগুলোতে দেখা যায়। সর্বশেষে পল্লী সমাজের অশিক্ষিত জনগণের মধ্যেও পশ্চিমের অনুকরণ স্পৃহা লক্ষ্য করা যায়।

মুসলিম আমলে যে মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল ইংরেজ আমলের শেষ পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে সে সংস্কৃতির বিলোপ ঘটছে ধীরে ধীরে। ইংরেজ আমলের শেষ ভাগে বাংলার সংস্কৃতি অনেক অংশেই আর মিশ্র থাকেনি বা এতদ্দেশীয় থাকেনি, ইউরোপীয় জীবনাচরণের অনুকরণের বিদেশী চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হতে চাইছে। এখানে কথাটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে ইউরোপীয়রা এদেশে বসবাস করতে আসেনি, এদেশীয়ও হয়ে যায় নি। অপর দিকে মুসলমানেরা এদেশে বসবাসের জন্যই আসে এবং এদেশীয় হয়ে যায়। ফলে উভয় সংস্কৃতির চেহারা বিভিন্ন রূপে দেখা দেয়। সহজ কথায় এর তাৎপর্য এই যে আবহমান বাঙ্গালীর এতকালের ঐতিহ্য সুস্পষ্ট হয়েছিল, তা ইংরেজ আমলে যেন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। শিক্ষিত সমাজের মনোভঙ্গী বিশ্লেষণ করলে আমরা তাই দেখি। তারপর

ইতিহাসের চক্র দ্রুত এগিয়ে চলে আর এক রূপান্তরের দিকে। স্বাধীন পাকিস্তান ও ভারতের জন্মের চব্বিশ বছর পরে আবার জন্ম নিল স্বাধীন বাংলাদেশ। অর্থাৎ এক অখণ্ড ভারত তিনটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়লো।

স্বাধীন বাংলাদেশ ঐতিহ্য সূত্রে হিন্দু মুসলমান মিশ্র সংস্কৃতি, ইংরেজ আমলের এক জটিল সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লাভ করেছে। আর লাভ করেছে বিগত চব্বিশ বছরের নব সংস্কৃতির উত্তরাধিকার।

বিগত চব্বিশ বছরের কৃষ্টি - সংস্কৃতি কী চেহারা নিয়ে হাজির হয় সে সম্পর্কে কি আমরা সচেতন? গত চব্বিশ বছরে আমরা যা সৃষ্টি করেছি, যা শিল্পে সাহিত্যে রূপ দিয়েছি, তা কি তুচ্ছ? না তা আমরা অনায়াসে মুছে ফেলতে পারবো? একটি জাতির ইতিহাসে হয় তো চব্বিশ পঁচিশ বছর এমন কোন দীর্ঘ সময় নয় — তা - ও ঠিক। কাজেই এ প্রসঙ্গে সংস্কৃতিবান মানুষ মাত্রেরই চিন্তা ভাবনার সময় উপস্থিত হয়েছে।

প্রশ্ন থেকে যাবে আমরা কি নতুন কোন সংস্কৃতি নির্মাণে তৎপর হবো — আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ আমাদের জাতীয় চেতনা ও আদর্শ — আমাদের ধর্মভিত্তিক মানসিকতা এ সংস্কৃতি নির্মাণে সাহায্য করবে?

আরও প্রশ্ন, আমরা কী অতীতের হিন্দু - মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতির দিকে ফিরে যাব — না ইংরেজ আমলের পশ্চিমা ইঙ্গমার্কিণ সংস্কৃতি অনুকরণ করে যাবো?

এ সব প্রশ্ন আজ সকল চিন্তাশীল বাঙ্গালীর কাছে। তবে এ কথা সত্য যে আমরা অচিরেই পুরাতন সংস্কৃতির একটি রূপান্তর লক্ষ্য করবো — এ রূপান্তরের আয়োজন আমাদেরই সম্পূর্ণ করতে হবে।

এ দায়িত্ব আজ আমাদের স্বাধীন বাংলার প্রতিটি সংস্কৃতিসেবী শিল্প সাহিত্য অনুরাগীর ও দেশের কল্যাণকর্মী প্রতিটি মানুষের।

তথ্য নির্দেশ

১. History of Bengal, Ed. R. dC. Majumdar, Vol. I. 1943, Dacca, p. 63.

২. প্রাগুক্ত, ১৭১ পৃঃ ; গোবিন্দপালের রাজত্বকাল ১১৬২ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন।

৩ J. M. White, Anthropology. Bengali Trans. by M. Islam, Dacca 1974 p. 73। সংস্কৃতি শব্দ ঋগ্বেদে নেই, কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মন গ্রন্থে এই শব্দটি পাওয়া যায়। "ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেব শিল্পানি। এতেষাং বৈ দেব শিল্পা নাম অনুকৃতীহ শিল্পম অধিগম্যতে — হস্তীকংসো, বাসো হিরণ্যম অশ্বতরী রথঃ শিল্পম......। আত্ম সংস্কৃতির্বাব শিল্পানি। ছন্দময়ং বা ঐতের্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।" অর্থাৎ পার্থিব শিল্পসমূহ দেব শিল্প বা স্বর্গীয় শিল্পসমূহকেই প্রশংসা করে ; এই সমস্তের অনুকৃতিরূপেই এই পৃথিবীতে শিল্পকে ধরা হয়। শিল্প দ্রব্য কি রকম? হস্তী অর্থাৎ হাতীর দাঁতের কাজ ; কাংস বা ধাতব পাত্র, বিবিধ প্রকারের বস্ত্র, স্বর্ণ নির্মিত অলঙ্কারাদি অশ্বতরীযুক্ত রথ এই প্রকার। এই শিল্পসমূহ হইতেছে আত্মার সংস্কৃতি, এদির দ্বারা যজমান (গৃহস্থ) নিজেকে ছন্দোময় করে।' (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৮)

৪. Robert A. Ntsbet, Social Change and History, London, 1972, p. 199; Pears Cyclopeadia, Ed. L. M. Barkar, 75th editiou, London, 1966, J. 35

৫. Khondker Fazle Rabbi, Origin of the Mussalmans of Bengal গ্রন্থে অন্য রকম কথা বলা হয়েছে। দ্রষ্টব্য : বাঙলার মুসলমান (অনুবাদ), বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

৬. দ্রষ্টব্য : জৈনুদ্দিনের 'রসুল বিজয় কাব্য' ; ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ; মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৭, ঢাকা, পৃঃ ৬০ - ৬৪

৭. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৯৫৯, কলিকাতা, পৃঃ ৭৮ - ৮০।

৮. মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, ১৯৫৭, পৃঃ ৪৫।

৯. সুকুমার সেন, ইসলামি বাঙ্গালা সাহিত্য, কলিকাতা ১৯৫৯, পৃঃ ৮২।

১০ Report on the State of Education in Bengal. W. Adam, Calcutta, 1836, Ed. A N Basu, See Appendix.

আলোচনা

ক. গোলাম মুরশিদ

ডঃ আউয়াল বলেছেন সাহিত্য ধর্মভিত্তিক, সব দেশেই দেখা গেছে। তার আগে তিনি অবশ্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ধর্ম এককালে মুসলমানদের সংস্কৃতির চেহারায় ছিল না।

এদেশের হিন্দু এবং বৌদ্ধরা কিভাবে ধর্মান্তরিত হয়েছে, সে সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশের সংস্কৃতির কতটা সমন্বয় হয়েছে বা কতটা বিরোধ থেকে গেছে, সে বিষয়েও তিনি উল্লেখ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব যথেষ্ট আছে একথা তিনি বলেছেন। মসজিদ - মন্দির নির্মাণ বিষয় ও রীতির মধ্যে যে এই দুই সংস্কৃতির ছাপ পড়েছে সে সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। সবশেষে তিনি ইউরোপীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য কিভাবে বিপুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে। দেশ বিভাগের পরে ইংরেজদের প্রভাব চলে যায়নি, বরং অনেকাংশে ইংরেজী প্রভাব এখনও দৃঢ়মূল, একথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। আমার অবশ্য মনে হয়েছে, সবশেষের 'প্যারাগ্রাফ' এ তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কেও কিছু উল্লেখ করেছেন।

বিষয়বস্তুর অনেক উপকরণ ডঃ আউয়াল সংগ্রহ করেছেন, তবে একটার সঙ্গে আরেকটা closely releated নয়, বরং পারস্পর্যহীন

বলে আমার মনে হয়েছে। আসলে একটা কথার সঙ্গে আরেকটা কথা যুক্তির মধ্য দিয়ে আসে, কিন্তু আমার মনে হয়, লেখক সর্বত্র তা মেনে চলেননি। সব উপকরণ মিলিয়ে লেখকের একটা কিছু বলবার থাকে কিন্তু এতে সব উপকরণ মিলিয়ে লেখক আমাদের কিছু বলেন নি। একটা সত্যে উপনীত হবার চেষ্টা থাকে মানুষের কিন্তু কোন সত্যের সন্ধান তিনি আমাদের দিতে পারেন নি। ইতিহাস সম্পর্কিত একটি সেমিনারে যে লেখা পঠিত হবে সে লেখার মধ্যে আরো কিছু ইতিহাস সচেতনতা থাকলে ভাল হয়। এলেখাটি প্রকাশের আগে যেন এর ভাষা যথেষ্ট মার্জিত ও সংশোধিত হয়। কোথাও কোথাও রীতিমত তো হেঁয়ালী দেখতে পাই। যেমন তিনি বলেছেন "সামাজিক জীবনের 'প্যাটার্ণ' তার অর্থনৈতিক জীবনের বিশেষ বিন্যাসে সাংস্কৃতিক জীবনের আলেখ্য হিসেবে প্রকাশিত হয়" — আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। সেজন্য আমার বক্তব্য, লেখাটি সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারবে যদি কিছুটা মার্জিত করা হয়, এবং লেখক যদি তাঁর নিজের বক্তব্য সম্পর্কে সচেতন হন তিনি যদি বুঝতে পারেন তিনি কী বলতে চান। আর তিনি পরিশ্রম করেছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটি যে একটি প্রশংসনীয় উদ্যম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার ধারণা এদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে সত্যি অনেক লেখা উচিত, এ নিয়ে অনেক গবেষণা করা উচিত।

খ. আবদুর রহমান

আমার হয় তো অনেকটা ধৃষ্টতা হবে এ ধরণের সুধী সম্মুখে কোন কিছু সমালোচনা করা, এবং বিশেষ করে যখন প্রবন্ধের প্রথম দিকের

কিছুটা আমার শোনার সৌভাগ্য হয়নি। তবে আমি যতটুকু শুনেছি তাতে করে আমি একটা কথাই বলতে চাই — সাহিত্য এবং সংস্কৃতি প্রসঙ্গে কোন কিছু বোধহয় খুব সম্ভবতঃ অঙ্কের মত দু'য়ে দু'য়ে চার হিসেবে বলা যায় না। কারণ আজ হয়তো যে জিনিসটাকে আমি সাহিত্য বলছি, যে দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এর 'মেজারমেন্ট' নিচ্ছি, সে জিনিসটি অত্যন্ত আপেক্ষিক এবং হয়তো এটা অন্যের মানদণ্ডে অন্যরকম হতে পারে। যেমন সাহিত্য প্রসঙ্গে একেক জন একেক কথা বলেছেন। ধরা যাক কবিতা প্রসঙ্গে। প্রশ্নটা এখানে আসছে এজন্যই যে একজন সাহিত্যিক এখানে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রসঙ্গে কিছু বলেছেন। যেমন ধরুন কবিতা কাকে বলে, এ ধরণের প্রশ্ন যদি ওঠে তা হলে কেউ বলবেন best words in best order — সেটাকে আমরা মেনে নিই না। আবার কেউ হয়তো Wordsworth এর মতো বলতে পারেন Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. হয়তো আরেকজন বলতে পারেন সে শুধুমাত্র ভাব থাকলেই কি কবিতা হয়ে গেল, তার মধ্যে যদি সুন্দর বাণীবিন্যাস না থাকে? ঠিক তেমনি ভাবে আমরা যখন সামাজিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করি তখন একজন সমাজবিজ্ঞানী তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন, একজন মনোবিজ্ঞানী তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন, একজন অর্থনীতিবিদ তাঁর নিজস্ব angle থেকে দেখবেন। কারণ এই যে দেখা, এই যে focus, এর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা পার্থক্য আছে। একজন বাংলার অধ্যাপক তিনি তাঁর যে প্রবন্ধে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস তুলে ধরবার প্রয়াস চালিয়েছেন, সেটা অত্যন্ত abstract, কিন্তু তার মানে এই নয় এটা meaningless, এটা কিছুই হয়নি। বুদ্বুদের মতো অর্থহীনতা ফুটে উঠেছে এবং মিশে গেছে অন্তত আমার মনে হয়নি। আমি তার

মধ্য থেকেও কিছুটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি। যেমন তিনি বলতে চেয়েছেন, "আমাদের সাহিত্যের মধ্যে, আমাদের সংস্কৃতির ভিতরে আমাদের চলনের ভিতরে পশ্চিমী সভ্যতার কিছুটা ছোঁয়া লেগেছে।" সাহিত্যে যদি খুঁজি, পাব — চলচ্চিত্রে যদি খুঁজি, পাব। তাছাড়া তিনি বলেছেন, আমাদের এদেশ আবহমান কাল ধরেই কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং আমাদের ঘরবাড়ী, আমাদের সাহিত্য, মন মানস, সমস্ত কিছুর মধ্যে এর একটা ছোঁয়াচ রয়েছে। এমনকি 'কালচার'কে যদি দু'টো ভাগ করে দেখা হয়, তাহলে আমরা একটাকে বলতে পারি material culture আর একটা non - material culture; Material culture এ আমরা দেখেছি Western culture এর কিছুটা ছোঁয়া এসেছে এবং এর ভিতরে অর্থনীতির কিছুটা কারণ রয়েছে। যেমন ধরুন আমাদের এই 'বিল্ডিং' টা। এটা হচ্ছে architectural. 'আর্কিটেকচার' নিয়ে যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাই, তাহলে দেখতে হবে এটা কোথাকার 'আর্কিটেকচার'। এরকম চিন্তা করবার আগে আমাদের দেখতে হবে এই সাহায্যটা কোথা থেকে এসেছে। কারণ আমি আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য নেবো, আর ব্রিটিশের স্থাপত্য অনুসরণ করবো, এটা কখনও হয় না। কারণ যে দেশ সাহায্য করে তার কিছু না কিছু প্রভাব রেখে যেতে চায়। সে জন্য আমাদের দেশের materialistic culture এর কথা যখন চিন্তা করতে যাব, বিশ্লেষণ করতে যাব, তখন Western culture এর reflection কতখানি এখানে হয়েছে সেটা অবশ্য ধরা পড়বে, সে কথা তিনি উল্লেখ করেছেন যদিও খুব অল্প কথায় তিনি তা উল্লেখ করতে চেয়েছেন। একটা ত্রিশ মিনিটের প্রবন্ধের মধ্যে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে তুলে ধরতে পারবেন

একথা অন্ততঃপক্ষে আমি বিশ্বাস করিনা। আর culture যে কি, এ জিনিষটা যে কি, এ নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে। যেমন একজন সমাজ বিজ্ঞানী বলবেন হয়তো Taylor এর সূত্র ধরে, "Culture is that complex whole — which includes art, moral religion and any other capabalities acquired by man as a member of the society. হয়তো আরেকজন, যিনি হয়তো metarialistic interpretation মেনে চলেন, তিনি হয়তো বলবেন, না, 'রিলিজিয়ান' এর এখানে কোন স্থানই নেই। আবার হয়তো আরেকজন, যিনি Anthropologist, তিনি হয়তো আরেক ভাবে দেখবার চেষ্টা করবেন। সুতরাং আমি যে কথাটা আগে বলতে চেয়েছি ঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে দু'য়ে দু'য়ে চার কখনও হয় না, তবে পর্যালোচনার মাধ্যমে একজন একটা জিনিষকে তুলে ধরেন সেটা আমরা অবশ্যই গ্রহণ করতে পারবো, নিশ্চয়ই তার মধ্যে পাবার মতো কিছু আছে। আমার কাছে যে জিনিষটা খারাপ লেগেছে, ব্যক্তিগতভাবে যে জিনিষটা আমি অনুভব করেছি, সেটা হচ্ছে একজন লেখকের রচনাশৈলী সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। আমি বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকও নই। কিন্তু আমি জানি প্রত্যেকেরই লেখার একটা নিজস্ব 'স্টাইল' থাকে। তাই এটা আমি অবশ্যই বলতে পারি না যে এটা কোন বাংলা হয়নি — এটা বলা আমার ধৃষ্টতা। এটা আমাদের সেমিনার কাজেই এখানে কিছু বিতর্ক বা মতভেদ হতে পারে, কিন্তু আমি এটা মনে করিনা যে কেউ এখানে 'সাজেশন' দেবেন যে এটা যখন ছাপানো হবে তখন correction করে ছাপানো উচিত। এ ধরণের মন্তব্য করে আমার মনে হয় একজন অধ্যাপককে খুব খাটো করে দেখা হয়েছে — এটা আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছে।

গ. আবদুর রহিম

প্রফেসর উইর আউয়াল সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেছেন, এ সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্রথম হলো 'কালচার'। 'কালচার' বলতে আমরা কি বুঝি ? 'কালচার'টা দু'টো অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথম হচ্ছে, 'লিটারারী সেন্স' — সেখানে কালচার হচ্ছে refinement, good manners, ইত্যাদি। আরেকটা হচ্ছে, historical sense। Historical sense হচ্ছে, কালচার বলতে আমরা বুঝি — way of life — মানুষের জীবনের ধারা, জীবনের যত কিছু আছে, জীবন যাত্রার মধ্যে যত কিছু আছে সব কিছু 'কালচার' এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। আমরা মনে করতে পারি যারা অসভ্য জাতি তাদেরও একটা 'কালচার' আছে। সেটা হচ্ছে তাদের জীবনযাত্রা। Their way of life is their culture — সুতরাং আমরা ঐতিহাসিকরা সাধারণতঃ 'কালচার'কে 'অবজেকটিভ সেন্স' এ ব্যবহার করে থাকি। একটা দেশের জীবন-যাত্রার যত কিছু আছে, সব কিছু মিলিয়ে তার 'কালচার'। সুতরাং 'কালচার' সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে এটার যে সীমা কোথায় তা বলা যায় না, এটার কোন সীমারেখা নেই, জন্ম থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবনের সব কিছু নিয়ে আলোচনা করলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় 'কালচার' সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। আমি বাংলাদেশের 'কালচার' সম্পর্কে Social and Cultural History of Bengal দুটো 'ভল্যুম' লিখেছি। হয়তো আপনারা অনেকে জানেন না, বই দুটো করাচীতে ছাপা হয়েছে এবং বিদেশে বহু বিক্রি হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলাদেশে

বেশী এটা প্রকাশ পায়নি। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে মুসলিম সংস্কৃতি সম্পর্কে আমি যথেষ্ট পরিশ্রম করে, যথেষ্ট গবেষণা করে একটা বই লিখেছি। কিন্তু এর পরেও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেকে বলেছেন উনি তো 'কালচার' সম্পর্কে অনেক কিছু লেখেন নি। দুটো 'ভল্যুম' লেখার পরেও অনেকে সমালোচনা করেছেন যে 'কালচার' সম্পর্কে অনেক কিছু তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, অনেক কিছু লেখার আছে। সুতরাং প্রফেসর আউয়াল এই আধ ঘন্টার মধ্যে 'কালচার' সম্পর্কে যে আলোচনা করবেন, সেটা খুব যে একটা খুশীর হবে এটা আশা করা যায় না। উনি অনেকটা সাহিত্যিকের দৃষ্টি নিয়ে 'কালচার'কে বিচার করেছেন। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বিচার করলে আরও অনেক কিছু 'কালচার' সম্পর্কে বলবার আছে। প্রথমতঃ মনে করতে হবে কয়টি জিনিস নিয়ে 'কালচার', 'কালচার' এর কয়টা উপাদান। প্রথম উপাদান হলো People is the best source culture, দেশ ও লোকের বৈশিষ্ট্য, তার চরিত্র, তার ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তি হিসেবে তার বিভিন্ন দিক এটাই হলো তার basie source of culture। আর একটা হলো History। History বাদ দিয়ে কোথাও culture হয় না। বিভিন্ন সময়ে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ যে সমাজ ও দেশ গঠন করেছে, পৃথিবীকে উপভোগ করেছে, তার ভিতর দিয়ে কত রকমের কৃতিত্ব তার প্রকাশ পেয়েছে — সেগুলোকে ইতিহাসে খুঁজে দেখতে হবে। History is the noble force of culture, এবং 'থার্ড ফোর্স' হলো Geography। Geography is the conditioning force। কারণ 'জিওগ্রাফী'তে মানুষের জীবন, মানুষের পরিবেশ, ইতিহাস নানাভাবে conditioned হয়। এজন্য এটাকে আমি বলি conditioning force of culture আমাদের বাংলাদেশের 'কালচার' সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে

দেখি যে দেশটি এখানে হিন্দু ছিল, হিন্দু 'কালচার', তারপর Buddhist culture এবং অতঃপর যখন মুসলমানরা আসলো, মুসলমানরা বাইরে থেকে এলো, কি দিল এই বিদেশী আরব মুসলমানেরা? কী দিল? তারা তাদের ধর্ম, কোরাণ এবং তাদের সেই Arabic language — মুসলমানদের মধ্যে যে ইসলাম, যে ধর্মীয় opinion, সেটা আরব মুসলমানরা প্রতিষ্ঠা করে। তারপরে Turkish Muslim, তাদেরও কিছু স্থলত contribution ছিল in the devlopment of culture — যেমন নাম, তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, তাদের খানা। আমরা যে বলি জালাল উদ্দিন, আলাউদ্দিন এ সমস্ত নাম হোসেন শাহী তুর্কী নাম। খাবারের বেলায় যেমন পোলাও কোর্মা কালিয়া এ সমস্ত 'টার্কিশ'। তারপর ফার্সী। যারা ইরাণ থেকে এসেছেন, ইরাণী কর্মচারী, ইরাণী teacher, ইরাণী কবি সাহিত্যিক, এদের অবদান রয়ে গেছে আজও বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে। এভাবে আমরা প্রত্যেক মুসলমানই তার বিশেষত্ব তার দান বাঙ্গালী কৃষ্টির মধ্যে দেখতে পাই। আমি বেশি কিছু বলতে চাই না, কারণ এ সম্পর্কে হয়তো অনেকের অনেক কিছু বলবার আছে। আমি এ কথাই বলছি যে আউয়াল সাহেব যে প্রবন্ধটা লিখেছেন সেখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্যিকের এবং উপাদান সংগ্রহ করেছেন মূলতঃ সাহিত্য থেকেই। কাজেই আউয়াল সাহেব সমসাময়িক মুসলিম ইতিহাস থেকেও যে উপাদান নেওয়া যায়, এটা তিনি লক্ষ্য করেন নি এবং বাংলাতেও অনেক মুসলমানের ইতিহাস লেখা হয়েছে — সেগুলি থেকে সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। তারপর বৈদেশিক ভ্রমণকারী যাঁরা এদেশে এসেছেন, তাঁদের কাছ থেকেও আমরা সমাজ সম্পর্কে ও কৃষ্টি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। আমার মনে হয়, প্রফেসর আউয়াল সে সব লক্ষ্য করেন নি।

তারপর আর একটি কথা তিনি বলেছেন, যেটা আমাকে 'স্ট্রাইক' করেছে বিশেষ ভাবে। সেটা হচ্ছে, তিনি বলেছেন বাংলাদেশে মুসলমানদের মসজিদ এবং হিন্দুদের মন্দিরের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটেছে। বাংলাদেশে এ রকম দৃষ্টান্ত আমি অবশ্য কোথাও পাইনি অথবা দেখিনি। তবে তিনি যদি এরকম কোন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন তবে সেটা খুবই ভাল হবে, অনেকেই জানতে পারবে। এ সম্পর্কে আমার জিজ্ঞাসা আছে।

ঘ. মাহমুদ শাহ কোরেশী

আমি মঞ্চে আসার সময় মাননীয় পরিচালক আমাকে তিন মিনিট, এবং সভাপতি আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছেন। আমি চার মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করবো।

অধ্যাপক আউয়ালের যে প্রবন্ধ, সেটি আলোচনা করার কথা ছিল আমার এবং আমি কিছুটা সমালোচনা লিখেছিলাম। বোধ হয় এক চতুর্থাংশও লিখতে পারিনি, এর মধ্যে সাত পৃষ্ঠা হয়ে গেছে। সেটা এখন ছাপানো হবে কিনা তাও জানি না। তবে এখানে যে আলোচনা হয়েছে সেটা খুবই উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে আজকের সকালে যে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সেমিনার শুরু করেছি তাতে আমাদের মূল সভাপতি ডঃ মল্লিক এবং উপাচার্য ডঃ বারী একটা কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে, বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বাংলাদেশের সার্বিক পরিচয় যাতে বিধৃত থাকে সে ধরণের ইতিহাস রচনায় আমরা যেন প্রয়াসী হই। সেদিক থেকে ডঃ আউয়ালের যে প্রবন্ধটি আমি আলোচনা করতে নিয়েছিলাম বা ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলাম এবং যেটা বোধগম্য কারণে করতে পারলাম না — সেই প্রবন্ধে

আমি দেখেছি, তিনি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে পর্যালোচনা করার জন্যে একটি রূপরেখা নির্মাণে প্রয়াসী ছিলেন। 'মেথলডজি'র দিক থেকে অনেকে তাঁর সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করবেন এটা স্বাভাবিক। ডঃ মুরশিদ কিংবা আই. বি. এস-এর আমরা modern methods গুলো নিয়ে যেভাবে চিন্তা ভাবনা করি, সেভাবে তিনি অগ্রসর হননি; এবং আমার মনে হয় এটা বলা প্রয়োজন — ডঃ আউয়াল তাঁর ভূমিকায় এ কথা বলেছেন — তিনি ডঃ আউয়াল, সাহিত্যের একজন ছাত্র হিসেবে এবং বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে কোন নতুন method কিংবা নতুন দিক্ নির্ণয়ের চেষ্টা বা সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার কোনো প্রয়াসও করছেন না। এ সম্পর্কে কয়েকটি জিজ্ঞাসা তাঁর মনে জেগেছে এবং সেই জিজ্ঞাসার অভিব্যক্তিই তিনি তুলে ধরতে সচেষ্ট। এদিক থেকে আমি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ রহিমের যে প্রাথমিক মন্তব্যটি ছিল সেটির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত এবং আমি মনে করি যে বিষয়টি অত্যন্ত বিতর্ক পূর্ণ এবং আমাদের ছাত্র আবদুর রহমান এ বিষয়ে যা বলেছে সেটি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। ডঃ আউয়ালের প্রবন্ধটি যদি সম্পূর্ণ একজন সাহিত্যের ছাত্রের প্রবন্ধ হিসেবে ধরি তবে সেদিক থেকে এটিকে সম্পূর্ণ ভবে গ্রহণ করা যায়। ডঃ মুরশিদ ভাষার প্রশ্ন তুলেছেন। আমার মনে হয় আমার মত তিনিও যে প্রাথমিক 'টাইপ্ড' 'কপি'টি পেয়েছেন, সেটি দেখেই বিভ্রান্তিতে ভুগছেন। কারণ ডঃ আউয়াল যখন প্রবন্ধটি পড়েছেন তখন তার সঙ্গে আরো কিছু যোগ করেছেন, এবং এর ভাষাগত দিকটির পরিশোধন করেছেন। সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ এবং আলোচনা সব সময় পরিমার্জনা করা হয়ে থাকে পরবর্তীকালে এবং অন্ততঃ হওয়া উচিত। আমি মনে করি যে আই. বি. এস. কিংবা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যান্য যে সব শাখা - সেগুলির সমস্যা

নিয়ে যদি আমরা কোন আলোচনা, সেমিনার করতে পারতাম তাহলে সবচেয়ে ভাল হতো। তখন আমরা এতদ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা নিয়ে এবং সংজ্ঞা নির্ণয় নিয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করতে পারতাম। সংস্কৃতির দু' একটি সংজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। আসলে মার্কিন নৃ-বিজ্ঞানীরা সংস্কৃতির ১৬৫ খানা সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন যা পাদটীকা সমেত দাঁড়ায় ১৬৭ খানা সংজ্ঞায়। এর ওপর আমি নিজের চোখে দেখেছি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের গোটা দশেক ফরাসী সংজ্ঞা। সুতরাং এই সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়েই আরও অনেক ব্যাপক কাজ করতে হবে। আমার মনে হয়, আমি চার মিনিট অতিক্রম করে ফেলেছি।

ঙ. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

মোটামুটি আমার যা বলার ছিল তা বোধ হয় বিভিন্ন আলোচক অনেকটা বলে ফেলেছেন। তবুও সেমিনারের নিয়ম অনুযায়ী প্রবন্ধ লেখককে সর্বশেষে কিছু বলতে হয়। আমার প্রবন্ধের প্রথম সমালোচক মনে হয় ভাল করে আমার প্রবন্ধটি শোনেননি। তাঁর মনে যে সব প্রশ্ন জেগেছে আমার প্রবন্ধের মাঝে কয়েক জায়গায় সে সম্বন্ধে আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে। এ বিষয়ে তাঁকে convince করাতে পারিনি, সেটা আমার ব্যর্থতা, স্বীকার করতেই হবে। কাজেই প্রবন্ধে আমার কোন বক্তব্য যে নেই একথা বোধহয় ঠিক নয়। প্রবন্ধে আমার অনেক বক্তব্য রয়েছে। আমি প্রথমে বলেছিলোম আমার কতকগুলি প্রশ্ন আছে সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রসঙ্গে। সংস্কৃতি কি? এটার হাজার গণ্ডা definition আছে, আবার এ নিয়ে অনেক বিতর্কও আছে। কাজেই যুক্তি তর্কের বিষয়, বিশ্লেষণ এবং আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়।

যাই হোক এটা আমার কাছে খুব ভাল লেগেছে যে আমার প্রবন্ধটির বিরূপ সমালোচনা হয়েছে বা অনেকে আমাকে সমাদৃতও করেছেন, অর্থাৎ আমার প্রবন্ধটি অনেকের মনে আলোড়ন তুলেছে, সেজন্য আমি আমি আনন্দ অনুভব করছি। এটা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের যে আমার প্রবন্ধটি শ্রোতাদের মনে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছে আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন আছে। আমার মনে হয় এ বিষয়ে আমার খুব বেশি কিছু বলবার অবকাশ নেই, কারণ আমাদের আলোচকরা দু' একটি প্রশ্ন তুলেছেন। যেমন 'আর্কিটেকচার' সম্বন্ধে। এটি হচ্ছে মন্দির এবং মসজিদে অনেক মিশ্রিত নক্‌শা আছে। আরেকটি কথা হচ্ছে, ইতিহাসের আলোকে আমি আমার প্রবন্ধটি লিখিনি সেজন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্য আমি দিতে পারিনি। আমি সাহিত্যের ছাত্র এবং সাহিত্যের লোক হিসেবে সংস্কৃতির যে পরিচয় আমরা পাচ্ছি, তথা সাহিত্যের উপাদানের মধ্যে সংস্কৃতির যে চেহারা এই হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ইংরেজ বা স্বাধীন ভারতবর্ষ কিংবা পাকিস্তান, অথবা বাংলাদেশ আমলে দেখা যাচ্ছে — এরই সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে জেগেছে এবং আমার মনে হয় সে প্রশ্নগুলিই আপনাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছি, হয়তো নানা কারণে তার সম্পূর্ণ সার্থকতা আসেনি। ধন্যবাদ।

চ. আজিজুর রহমান মল্লিক (সভাপতি)

'কালচার' এর সংজ্ঞা নিরূপণ নিয়ে বহুদিন ধরে তর্ক হচ্ছে। 'মার্কস-বাদী'রা যে ভাবে 'কালচার' এর সংজ্ঞা নিরূপণ করেন অন্যেরা তেমন ভাবে করেন না। সুতরাং 'কালচার' যে কী সেটা 'ডিফাইন' করতে

বেশ তর্কের সূচনা হয়েছে। স্বাভাবিক- ভাবে ডঃ আউয়ালের প্রবন্ধ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে এটা এক sense এ খুব ভাল। আমাদের প্রত্যেকের যে একটা নিজস্ব পছন্দ আছে, চিন্তা ধারার বিভিন্নতা আছে, এটা তাই প্রমাণ করে। আমরা আশা করি ডঃ আউয়ালের প্রবন্ধ নিয়ে যে আলোচনা হলো তাকে কেন্দ্র করে উনি তাঁর প্রবন্ধের কিছুটা রদবদল করতে পারেন। তবে তা করলেও ডঃ রহিমের সাথে একমত হয়ে বলা যায় যে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যাবে। কারণ এত কম সময়ে কম কথায় culture এর উপরে বিতর্কহীন প্রবন্ধ লেখা যায় না। ডঃ আউয়াল তাঁর প্রবন্ধের প্রথম দিকে যা উপস্থাপন করেছেন তাতে আমার নিজেরই কিছু জিজ্ঞাসা ছিল। তবে উঠাচ্ছি না এ জন্য যে এত অল্প সময়ে তার বিচার সম্ভব নয়। তবে ডঃ আউয়াল যেটা বলেছেন — তাঁর প্রবন্ধ যদি বিতর্কের সৃষ্টি করে থাকে তাতেই ওঁর অনেকখানি আনন্দ। সেটাই এ ধরণের আলোচনার, এই সেমিনারের সার্থকতা প্রমাণ করে। আমরা এখানেই শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি

ওহীদুল আলম

চট্টগ্রামের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি

চট্টগ্রাম হিন্দু মুসলমান উভয়ের প্রিয় দেশ। অবশ্য লোক সংখ্যা অনুপাতে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। একদিকে যখন মসজিদে আজান ধ্বনি উঠে, অন্যদিকে পাশের হিন্দু গ্রামে মন্দিরে কাঁসর ঘন্টাও বাজে। এখানে মুসলিম পাড়ায় মসজিদের সংখ্যা বেশী। মসজিদ ও তার সংলগ্ন পুকুর ও কবরস্তান। দিনে পাঁচ বার সেখান থেকে আজানের মধুর ধ্বনি সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। আজান ধ্বনি উঠতেই মুসলমান তার হাতের কাজ ছেড়ে দেয়, ওজু করে নামাজে দাঁড়ায়। কেউ নিজ ঘরে অথবা পাশের মসজিদে জমায়াতে শামিল হয়। একটা প্রবাদ আছে ঃ—

সারেং শুঁটকী দরগা
এই নিয়ে চাটগাঁ।

চট্টগ্রামের সারেং পৃথিবীর বিভিন্ন সামুদ্রিক অঞ্চলে জাহাজ চালায়, বড় বড় জাহাজের মাষ্টারী (সারেঙী) করে চট্টগ্রামী মুসলমান অনেক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। বাংলাদেশে একমাত্র চট্টগ্রামেই সমুদ্র থেকে মাছ ধরা হয় এবং সেই মাছ রৌদ্রে শুকিয়ে শুঁটকী করা হয়। চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে, দ্বীপাঞ্চলে, যেমন কুতুবদিয়া,

মহেশখালী, সেইন্ট মার্টিন দ্বীপ, রাঙ্গাবালি এসব স্থানে শুঁটকী মাছ তৈয়ার হয়। চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর, এখানকার দুঃসাহসী নাবিকগণ, জেলেগণ দুর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়।

সিলেটের মতই চট্টগ্রামের যত্রতত্র দরগা দেখা যায়। বার আউলিয়ার দেশ বলে চট্টগ্রামের খ্যাতি আছে। বস্তুতঃ ধ্যানগম্ভীর পর্বত, ছায়া শ্যামল সবুজের আড়ালে এককালে অনেক পীর দরবেশের আস্তানা ছিল এখানে। এককালে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল, মূল ভূখণ্ড থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন এই চট্টগ্রামের বিজন অরণ্য ও পার্বত্য দেশ আউলিয়াদের উপযুক্ত ধ্যানকেন্দ্র। সেজন্য সুদুর অতীতে এখানে পীর-বদর, বায়যীদ বোস্তামী, শাহ আমানত, মোহসেন আউলিয়া, একালের মৌলানা আহমদুল্লাহ শাহ (মাইজ ভাণ্ডারের বড় মৌলানা সাহেব), ও মৌলানা গোলাম রহমান শাহ (মাইজ ভাণ্ডারের ছোট মৌলানা সাহেব), আরো অসংখ্য পীর দরবেশ তাঁদের পূণ্য পাদস্পর্শে এদেশ ধন্য করেছেন।

কোন মুসিবতে এঁদের মাজারে শিণি মানৎ করা বা কবর জিয়ারৎ করা এদেশের লোকদের চিরাচরিত রেওয়াজ। চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় এসব পীরদরবেশদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বুজুর্গদের মাজারে বছরের কোন এক নির্দিষ্ট দিনে 'উরস' হয়। 'উরস' উদ্‌যাপন চট্টগ্রামের একটি বৈশিষ্ট্য — বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে। হিন্দু সমাজে স্মৃতি তর্পণ আছে, জীবনী আলোচনা, কাঙালী ভোজন, এসব দেখা যায়। মুসলমানগণ বিশ্বাস করে এসব বুজুর্গদের মাজার জিয়ারত করলে অনেক মুসিবৎ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। মামলায় পড়লেও অনেকে মাজার জিয়ারৎ করে। অবশ্য আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম সমাজ এসব ব্যাপারে ক্রমেই উদাসীন হয়ে উঠছে।

সুখ সম্পদ বা দুঃখ দুর্বিপাকে বাড়ীতে মিলাদ পড়ান, রসুলকে

স্মরণ করা, রসুলের নামে নাত পড়া, কেয়াম করা অর্থাৎ দাঁড়িয়ে রসুলের কাছে সালাম পৌঁছান মুসলমানদের রীতি। অবস্থাপন্ন মুসলমানদের বছরে একবার মিলাদ পড়ানো অভ্যাস।

পূর্বে হিন্দু বাড়ীতে বিয়ে উপলক্ষে যাত্রাগান, থিয়েটার, ফুলপাট, পোয়ার নাচ, ইত্যাদির আয়োজন হতো। ইদানিং সেসব দেখা যায় না। এর কারণ বোধ হয় অর্থনৈতিক। হিন্দুদের সেবাখোলার পাশ দিয়ে যেতে ভয়ে আমাদের গা ছম ছম করতো। এই সেবাখোলায় হিন্দুরা অদৃশ্য প্রেতাত্মার জন্য খাবার রেখে যেতো। হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী গেরুয়া বস্ত্র পরণে, কপালে তিলকের ফোঁটা কেটে চলে। হিন্দুদের পূজা - পার্বণ অনেক, তার মধ্যে দুর্গাপূজাই সব-চেয়ে সেরা। আনন্দ উৎসবে তারা বিসর্জনের দিন পর্যন্ত মুখর থাকে। অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে প্রতিমা তৈয়ার হয়। বিসর্জনের দিন বড় দীঘি বা নদীতে প্রতিমা ফেলে দেয়।

চট্টগ্রামে এককালে ব্রাহ্ম ধর্মের উৎকর্ষ দেখা দিয়েছিল। রাজনীতি ও সাহিত্যে যে সব হিন্দু উন্নতি দেখিয়েছেন তাঁরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্ম ধর্মের ছিলেন। এই শতকের প্রথম দশকেই চট্টগ্রামে ব্রাহ্ম ধর্মের আবির্ভাব দেখা যায়।

সাংসারিক অবস্থার উন্নতি, ব্যবসা বাণিজ্য টাকা পয়সা রোজগার করলে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান গড়ন করার রেওয়াজ আছে। নিজের নামে মাদ্রাসা দেওয়া, মসজিদ পত্তন। নিজের অর্থে মসজিদের সংস্কার সাধন — এসব করাকে তারা পবিত্র কাজ মনে করে। হাজার হাজার বছর পূর্বে যখন চট্টগ্রামের অধিকাংশ স্থান বঙ্গোপসাগরের তলে নিমজ্জিত ছিল, তখন এখানে ওখানে যেটুকু ডাঙা ছিল, তাতে পাহাড়ী জাতি বিচরণ করত; তারপরে সমুদ্র-কূলে কিছু কিছু জেলেদের আবাস গড়ে উঠে। এইসব জেলেরা

মাদ্রাজ প্রভৃতি সমুদ্র উপকূলের লোক। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জীবিকার সন্ধানে সমুদ্রকূল ধরে পূর্বদিকে চলতে চলতে চট্টগ্রামে ও আরো পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরা প্রাচীন দ্রাবিড়দের বংশধর বলে অনুমিত হয়। বর্তমান পাথরঘাটা অঞ্চলের জেলেরা তাদেরই বংশধর।

এখন দেখতে হবে কোন কোন জাত চট্টগ্রামে বসতি করেছিল এবং তাদের কি কি চিহ্ন চট্টগ্রামের ঐতিহ্যরূপে এখনো টিকে আছে। এ পর্যন্ত দেখা যায় কোন সুষ্ঠু সংস্কৃতিসম্পন্ন জাত চট্টগ্রামে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। চট্টগ্রামের ভাষার মধ্যেও এদের কোন চিহ্ন আছে কিনা দেখতে হবে।

চট্টগ্রামী ভাষায় বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব

মরহুম মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রামের ভাষাকে মিশ্র-ভাষা বলেছেন। প্রাচীনকাল থেকে এই দেশে বিভিন্ন জাতির আগমন হয়েছে। সাহিত্যবিশারদ অনুমান করেন সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে পালি-ভাষার প্রভাব অনুপ্রবেশ করেছিল। তারপর আরাকানের সাথে চট্টগ্রামের বহুদিন ধরে সম্পর্ক ছিল। আরাকানী মঘী ভাষাও চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছে। পশ্চিম বঙ্গের রাঢ়ীয় অঞ্চলের অনেক হিন্দু চট্টগ্রামের রাজদরবারে চাকুরী নিয়েছিলো।

আরব বণিকগণ খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে চট্টগ্রামে পদার্পণ করেন। আল হোসেনী নামক জনৈক আরব সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে বন্দর পত্তন করেন। তাঁর নিজস্ব অনেকগুলি জাহাজ ছিল। চট্টগ্রামের আরবী ভাষার প্রভাব যথেষ্ট। এই প্রভাবের নমুনা এত বেশী যে বলে শেষ

করা যায় না। যেমন, আকুল, আসর, তক্ত, ওজন, ইন্সাফ্, গোস্সা। আরবী ছিল ধর্মীয় ভাষা। কিন্তু ফার্সী ছিল আদালতী (কোর্ট) ভাষা, এমনকি মুসলিম শাসনের পরে ইংরেজ কলেক্টরগণকে ফার্সীভাষা শিখতে হতো শাসনের তাগিদে। ফার্সী শব্দগুলি এদেশের সমাজ জীবনে এমন ভাবে মিশে গেছে যে এখন পর্যন্ত তারা নিজ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। যেমন, আয়না, আরাম, আস্তে, আসমান, খুব, কম, খোয়াব। এরকম অসংখ্য নমুনা দেওয়া যায়।

চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী সুবিদিত। বহুদিন এই পর্তুগীজ জলদস্যু এদেশকে কবজায় রেখেছিল। এখনো পর্যন্ত চট্টগ্রামী ভাষায় তাদের ছাপ রয়ে গেছে। যেমন, পাল্কী, পিপা, সেরেক, ফিতা, বালতি, সাবান, সিপাহী, চাবি, জানালা, কাদিয়া, এরকম আরো বহু শব্দ আছে।

এরপর বলা যায় ইংরেজী শব্দের কথা। এটা যে ইংরেজ শাসনের ফলেই হয়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। যেমন, গুদাম (godown) পিয়ন (peon) বিস্কুট (biscuit) বোতল (bottle) ফিলট (plate) রশিদ (receipt)। বর্তমানে ইংরেজী শব্দ চট্টগ্রামী ভাষায় এতবেশী যে তার নমুনা দিয়ে শেষ করা যায় না।

সাহিত্যবিশারদ সাহেব চট্টগ্রামী ভাষায় প্রাকৃত শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে বলেছেন। যেমন আওলা (পাকঘর), উদ্যা (অনাবৃত) কচরা (ভিজা) কচাল (বেশী সিদ্ধ, যেমন, কচাল ভাত) পিরানী (দুর্ভিক্ষ) চতর (অগভীর)। তিনি আরো বলেন, ভাষার সহজী-করণ এখানকার লোকের একটা অভ্যাস। যেমন আঁরতনাই (আমাদের নেই) হিয়ান আ - ত্তে নাই (সেটা আমার কাছে নাই)।

চট্টগ্রামী ভাষায় ক ও খ, প ও ফ উচ্চারণে একটু বৈচিত্র্য আছে।

ক খ এর মতই উচ্চারিত হবে, তেমন জোর পড়বে না। যেমন কঁঅক্তে, প্রকৃত উচ্চারণ খঁঅক্তে। এখানে ড় - এর উচ্চারণ র - এর মতোই।

চট্টগ্রামের লোকগীতি

লোকগীতি সম্পদে চট্টগ্রাম খুবই সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই চট্টগ্রাম এবং প্রকৃতি বিচিত্র। দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্র ও ধ্যানগম্ভীর পর্বত, আবার তার পদপ্রান্তে সবুজ গালিচার মত বিস্তৃত ধানক্ষেত; অন্যদিকে পাহাড়ের কোলে কোলে স্রোতস্বিনী — এই অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ বাংলাদেশের আর কোথাও দেখা যায় না। কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায় বোধ হয় এই চট্টগ্রামকে লক্ষ্য করেই গেয়েছিলেন —

এত শুভ্র নদী কাহার
কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ
আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে।

চট্টগ্রামের যে লোকগীতিটি সব চেয়ে জনপ্রিয় —

চান মুখে মধুর হাসি
দেবাইল্যা বা নাইল মোরে সাম্পানের মাঝি
উত্তর বিলর দক্ষিণ ধারে সাম্পানওয়ালার ঘর
লাল বওটাত তুমি দিয়ে সাম্পানের উয়র

বাহার মারি যায়গৈ সাম্মানরে
ন মানে উজান ভাটি
দেবাইন্যা বানাইল মোরে
সাম্মানের মাঝি।

এই গানে একটি গভীর মনোবেদনা মনের বীণায় বাজতে থাকে। সাম্মান (সাম্পান) মাঝি, বওটা (সাধারণত পতাকা) এখানে গাল চান্ (চাঁদ, চন্দ্র) বাহার মানে সমুদ্র। চট্টগ্রামে আরবী প্রভাবের নমুনা।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি চট্টগ্রামের লোকসগীতের যে সুরটি খুবই জনপ্রিয় সেটা নিম্নলিখিত গানে শুনা যায় —

ভইনের বানারসী শাড়ী গায়
আনা ধরি সিতা পারে (ভইনে)
খিড়কীর কিনারায়
সাত কুটরী ন' (নয়) দরজা
মইধ্যে তালার ঘর
সেই তালার চাবি পাইয়ে (ভইনের)
ননাইয়া দেওর
চাবি পাইতাম খুলি চাইতাম রে
(ভইনে) কোন পালঙ্কে নিদ্রা যায়
আনা ধরি সিতা পারে (ভইনে)
খিড়কীর কিনারায়।

চট্টগ্রামী গান বা ছড়া অর্থাৎ চট্টগ্রামী ভাষায় যা কিছু বলতে হবে বা গাইতে হবে, চট্টগ্রামী ভাবেই তার উচ্চারণ করতে হবে। নতুবা

ইহার গঠন বা গাওন কোনটাই সম্ভব হবেনা। তার অর্থও উপলব্ধি করা যাবেনা। একথা লোকগীতির বেলায় কেন, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পুথি গান হাওলা, মার্ফতী প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। উচ্চারণে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই লক্ষিতব্য ঃ

ক - এর উচ্চারণ হবে খ - এর মতই, অথচ খ - এর মত জোর পড়বে না। অর্থাৎ ক ও খ উচ্চারণের বেলায় প্রায় একই রকম। অবশ্য এর মধ্যে স্থান বিশেষে ব্যতিক্রম ও আছে। যেমন, কোন পালঙ্কে উপরের গানে প্রকৃত চট্টগ্রামী উচ্চারণ খন (কোন্)। কিন্তু 'কিসের জন্য' চট্টগ্রামী ভাষায় 'কি অন্যাই' - এখানে ক খ - এর মত উচ্চারিত হবেনা, ক - এর মতোই উচ্চারিত হবে।

আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে চট্টগ্রামের উত্তর - পশ্চিমের সীতাকুণ্ড ও মীরের সরাই থানাধীন লোকদের উচ্চারণ নোয়াখালীর লোকদের মতই। তাদের বৈবাহিক সম্পর্কও নোয়াখালীর সাথে। এজন্য খাস চট্টগ্রামী লোকেরা যেখানে কঁ অত্তে - কোন্ ওয়াক্তে (কোন্ সময়) এভাবে ক - কে খ - এর মতোই উচ্চারণ করে। সীতাকুণ্ড, মীরের সরাইর মানুষ তাকে কোন্ অক্তে - ক - কে ক - এর মতই উচ্চারণ করে।

এভাবে চ ও ছ - এর উচ্চারণে তেমন পার্থক্য নেই। ছ - এর উচ্চারণ একই রকম, শুধু চট্টগ্রামে নয়, সারা পূর্ববঙ্গেই। পশ্চিমবঙ্গে চ - কখন ও ছ - এর মত উচ্চারিত হয়না, ছ - এর উচ্চারণ চ - এর মতোই, তার উপর জোর পড়ে বেশী করে। সারা পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বর্তমানে বাংলাদেশে চ ও ছ এর উচ্চরণের জন্যই মুসলমানকে মুছলমান, ইসলামকে ইছলাম লেখা হয়।

প ও ফ এর উচ্চারণের মধ্যেও তেমন তারতম্য নেই। কিন্তু ফ-এর মত জোর পড়বে না। উপরোক্ত গানটিতে — 'মিতা পারে' — 'পারে' উচ্চারণ হবে 'ফারে', ফ-এর মত জোর পড়বে না। চাবি পাইতাম উচ্চারণ হবে 'ছাবি ফাইতাম' — এখানে ছ ও ফ-এর উপর জোর পড়বে না।

উত্তর চট্টগ্রাম ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের মধ্যেও উচ্চারণের বিভিন্নতা আছে। দক্ষিণ চট্টগ্রাম বহুদিন আরাকানের (রোসাঙ্গের) প্রভাবে ছিল। কারণ ইহা আরাকানের শাসনে ছিল। উত্তর চট্টগ্রাম ছিল মুঘল বা পাঠানদের অধীনে অথবা ত্রিপুরার প্রভাবে। এ জন্য উত্তর চট্টগ্রামে উচ্চারণ ও রেওয়াজের মধ্যেও বিভিন্নতা লক্ষিতব্য। দক্ষিণ চট্টগ্রামে যেখানে দৈর্গ্যা (দরিয়া = সাগর). উত্তর চট্টগ্রামে সেখানে দৈর্য্যা (দইর্‌জা)। সে রকম দক্ষিণ চট্টগ্রামে গৈর্গ্যে (গইরগে), উত্তর চট্টগ্রামে তা গৈর্য্যে (গরইর্‌জে)।

চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত বুঝতে বর্মা দেশকে চট্টগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যাবে না। ব্রিটিশ যুগের আগেও চট্টগ্রামের সাথে বর্মার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। বর্মাদেশ চট্টগ্রামী লোকদের জন্য শুধু রুজি রোজগারের স্থান না। চট্টগ্রামী যুবক বর্মী সুন্দরীকে দেখে দেশের নব বিবাহিতা বধূর কথা ভুলে গেছে। চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল থেকে সুদূর বর্মাদেশ পর্যন্ত — এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অদ্ভুত। চট্টগ্রামের তরুণী নববিবাহিতা বধূ স্বামীর অবর্তমানে বিরহের জ্বালায় অস্থির। তদুপরি, পাড়ার তরুণদের অত্যাচারে তার জীবন অতিষ্ঠ। সেই পরিবেশে চট্টগ্রামের বহু লোকসঙ্গীত সৃষ্ট হয়েছে। একটি নমুনা—

রেঙ্গুন রঙ্গিলার মনে মজি দোল মন
এ মতে দেবানা হৈয়া রৈল কতজন রে

রেঙ্গুন রঙ্গিলারে
মায়ে বলে ওরে ও পুত রেঙ্গুন ন যাইস তুই
হালের গরু বেচিয়ারে, বিভা করাম মুই
রেঙ্গুন রঙ্গিলারে
সদরঘাটা যাইয়ে মর্দ্দে কিনি লইল চুড়া
হু হু করি কাঁদি উডিল্ আমার মা বাবা বুড়া,
রেঙ্গুন.....
আরাকানেতে যাইরে মর্দ্দে কিনি লৈল দই
তরুৎ গরি মনৎ উডিল ত্যামার মা বাবা কই
রেঙ্গুন.....
রেঙ্গুনের বর্মা মাইয়া এত ঠমক জানে
সিনার উয়র ফলের কলি ইশারাতে টানে
রেঙ্গুন.....

মার্ফতী গান

আধ্যাত্মিক গানের কেন্দ্র চট্টগ্রামের মাইজ ভাণ্ডার ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার মীর্জার খিল। এছাড়া আরো আছে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে। তবে এই দুইটিই প্রসিদ্ধ।

চট্টগ্রামের মাইজ ভাণ্ডার। সারা বাংলাদেশে, এমন কি বাংলার বাইরেও এর সুনাম আছে। অনেক ভক্ত মাইজ ভাণ্ডার দরবার শরীফের বড় মৌলানা (মৌলানা আহমদুল্লাহ্ সাহেব) ও ছোট মৌলানাকে (মৌলানা গোলাম রহমান সাহেব) নিয়ে অনেক গীতি রচনা করেছেন। চট্টগ্রামে তথা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এসব গান খুবই জনপ্রিয়। বাদ্যের মধ্যে শুধু একটি দুলকী আর কচিৎ কোথাও হারমোনিয়াম। মাত্রা রক্ষা করতে দুলকীর প্রয়োজনই সর্বাধিক। মাইজ ভাণ্ডারের গানগুলি তালের দিক দিয়ে প্রায় এক রকম সুর।

বিভিন্নতা কচিৎ লক্ষিতব্য। একথা উল্লেখযোগ্য যে মাইজ ভাণ্ডারকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের কবিয়াল রমেশ শীল অনেক গান লিখেছেন এবং সেগুলি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ হয়েছে। তবে মাইজ ভাণ্ডার ও মির্জার খিল এই দুই কেন্দ্র ছাড়াও চট্টগ্রামে বহু প্রাচীন কাল থেকেই আধ্যাত্মিক গান রয়েছে অনুমান করা যায়। সে সব গানের লেখক কে বা কাহারা, সঠিক বলা মুশকিল। লেখক যিনিই হোন, গানগুলো যে অতি উচ্চাঙ্গের, একথা অনস্বীকার্য।

১

দনগেন তোর মিছা বড়াই কর না
মন পাগলারে গুরু বুঝ না (২)
ওহো রে অবোধ মন
বুঝ গুরুর শ্রীচরণ
নৌকা ভাসাইয়াছে
কি বা রঙ্গ চাইয়ারে
নৌকা খুলিয়া দেশে চল না
মন পাগলারে গুরু বুঝ না।

২

আমার ভাবতে গেল দিন
আমার বুঝতে গেল দিন
অতিনা সুতার ঠানারে মই টাইন্যম কতদিন।
অতিনার ঘর লে আউলার বাড়ী
আউলার আউলার খেলা
এক আউলার ভিতর অন্তাই
তিন আউলার মেলা।

৩

ছাই রঙের মসল্লা দিয়া.....যে কইরাছে তোর গঠন
দিবানিশি ভাব বসি ভাব তার কিছুক্ষণ।
হস্ত দিলে সেবিবারে
জিহ্বা দিলো ডাকিবারে
নয়ন দিলো দেখিবারে অন্ধ অন্ধ বা ঠেলা কি কারণ।
ছাই রঙের.....
আগুন মাটি বাতাস
এক যুগেদে কইরলা প্রকাশ
সেথায় গেলি দেখতে কারি কোন খানে তোর সিংহাসন।
ছাই রঙের.....
লাহুতে মোকামে যাবি
মক্কা মদিনা গো দেখবি
সেথায় গেলি দেখতে পাবি কোন খানে তোর সিংহাসন।

মাইজ ভাণ্ডারী গান থেকে আমরা বুঝতে পারি সেখানে মওলানা-ই-মুর্শীদ আল্লার সান্নিধ্যে পৌঁছার জন্য তিনিই মাধ্যম। আল্লার নূর তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত। বস্তুতঃ মাইজ ভাণ্ডারের ছোট মৌলানার (মৌলানা গোলাম রহমান সাহেব) গায়ের রং ছিল সোনার মত। সব মাইজ ভাণ্ডারী গানে সেই ভাবই ব্যক্ত হয়েছে। মাইজ ভাণ্ডারের প্রভাব সবচেয়ে ব্যাপ্ত। শুধু সাধারণ্যে নয়, বহু উচ্চশিক্ষিত লোক পর্যন্ত মাইজ ভাণ্ডারের ভক্ত, এমন কি যাঁরা ভক্ত নন, তাঁরাও মাইজ ভাণ্ডারের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব দেখান না। বস্তুতঃ দুই মৌলানাই অতি উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। মৌলানা গোলাম রহমান সাহেব মজজুব (বেখোদ) ছিলেন। তাঁর হাতে সব সময় পানি ঢালা হতো। তাঁর বাহ্য জ্ঞান থাকতো না।

এজন্য মাইজ ভাণ্ডারে ভক্তগণ উদ্দাম এবং তারা আনুষ্ঠানিক ধর্মের অনুসারী নয়। নিজকে 'ফানা' অর্থাৎ উজাড় করে দেওয়ার একটি প্রবণতা আছে।

মাইজ ভাণ্ডারের প্রভাব ব্যাপক এবং উহা শুধু চট্টগ্রাম নয়, বাংলাদেশ ও তার বাইরেও বিস্তৃত। পক্ষান্তরে, মীর্জার খিলের প্রভাব অনেকটা স্থানীক। মীর্জার খিলের (সাতকানিয়া থানায়) ভক্তগণ আনুষ্ঠানিক ধর্মের অনুসারী। তারা নামাজ কখনও বাদ দেন না। মাথায় এক রকম সাদা কাপড়ের টুপি (যাতে চাঁদের ফর্মা আছে) তাকে চান (চাঁদ) টুপি পরেন। এই টুপি দ্বারা তাঁরা মীর্জার খিল তরিকার লোক বলে পরিচিত হন। মাইজ ভাণ্ডারীদের মাথায় টুপির বদলে লম্বা বাবড়ী চুল, তাহা সুবিন্যস্ত, গায়ে সাদা সুতী আলোয়ান ও পরণে সাদা তহবন্দ। তাঁরা গুড়গুড়ি (হুক্কা) খেতে অভ্যস্ত।

মীর্জার খিলের অনুসারীদের জজ্‌বা থেকে জিকিরের ভাবই বেশী। মাইজ ভাণ্ডারীদের বাজনা, ঢুলকী, দোতারা, — মীর্জা খিলের অনুসারীদেরও সে সব আছে। তবে তাঁদের জজ্‌বা বা জিকির যেন আরো সংযত। নীচের মীর্জার খিল মহফিলের গানটিতে সে কথা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সাতকানিয়া থানার চুনতী অঞ্চলের সঙ্গীত সাধক জনাব হেফাজতুর রহমান বি, এল, (১৮৮৮—১৯৬৫) অনেক গান রচনা করেছিলেন। নীচের গানগুলি থেকে মীর্জার খিলের পরিবেশ ফুটে উঠবে। প্রথম জিকিরের পরিবেশ।

আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ
লা ইলাহা ইল্লাহ লা ফায়েলা ইল্লাহ
লা মউসুফা ইল্লাহ লা মউজুদা ইল্লাহ
সর্বদ্রষ্টা সর্বশ্রোতা সর্ব বিদ্যমান তু
সর্ব জ্ঞানী সর্ব গুণী সর্ব শক্তিমান তু—

এ ধরণের অনেক গান আছে, তবে তার সাথে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের সাথে তেমন কোন পার্থক্য আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ হিন্দুরা ত রাঢ়ীয় অঞ্চল থেকে নবাবী আমলে নবাবদের অধীনে চাকরী নিয়ে এদেশে আগমন করে। এদেশের আদিম অধিবাসী তারা তিব্বতী, বর্মী, কুকী, সুসঙ প্রভৃতি পার্বত্য জাতি। সর্ব প্রথম যে সভ্য জাত এদেশে আস্তানা ফেলেছিল তারা আরব। সেটা অষ্টম শতাব্দীর কথা। এর বহু পরে নবাব সরকারে চাকুরী (গোমস্তা, বকসী, তহশীলদার) নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিন্দুগণ চট্টগ্রামে পদার্পণ করে। এদেশের 'কালচার' বা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে মুসলমানদের মাঝেই, তবে বৌদ্ধরা যদি বৌদ্ধ যুগে এদেশে এসে থাকে, তাহলে তারাই খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে পটিয়ার হাইদগাঁওয়ে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করে, একথা কোন কোন ঐতিহাসিক বলে থাকেন। তা যদি হয় বৌদ্ধরাই এখানের আদি বাসিন্দা। বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুশাসন সঙ্গীত প্রাকৃত বা পালিতেই আছে।

চট্টগ্রামের কবিয়ালগণ

কবির গান বা কবির লড়াই এদেশে বহুকাল যাবৎ জনসাধারণকে আনন্দ দিয়ে আসছে। একটি বিরাট ব্যাপার — মুখে মুখে কবিতার লাইন রচনা করে বিপক্ষকে প্রতিহত করা। তাতে যেমন উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ছন্দ ও তালজ্ঞান। তারা কবিতার পঙক্তি আওড়াবার সময় শরীরকে ছন্দের তালে নাচায়, মাথাকে দোলায়। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার কিভাবে তারা মুহূর্তেই কবিতার লাইন তৈরী করে এবং তাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে বিপক্ষকে ঘায়েল করে, অসংখ্য শ্রোতাকে মুগ্ধ করে।

চট্টগ্রামের কবিয়ালদের মধ্যে রমেশ শীল নির্দ্বিধায় এক রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থেকে শিক্ষিত বিদগ্ধ সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা

পেয়েছিলেন এবং তাঁর জনপ্রিয়তা এজন্যই। রমেশ শীলের (চট্টগ্রামের গোমদণ্ডী অঞ্চলে বাড়ী) কবিয়াল প্রতিভাকে রাজনৈতিক দলের লোকেরা নিজেদের সুবিধামত কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর কবিতা কাব্য রসের চেয়ে একটি সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদেই যেনো রচিত। নতুবা চট্টগ্রামে অনেক কবিয়াল আছেন যাঁরা যুগে যুগে এই দেশে কাব্য রস পরিবেশন করেছিলেন। চট্টগ্রামের নোয়াপাড়া অঞ্চলের মকবুল আহমদ (মকবুল পণ্ডিত উনবিংশ শতকের শেষার্ধে জন্ম।) বহুদিন এই দেশের মনে আনন্দ পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর কোন রচনা সংগৃহীত নাই। পটিয়া থানার বৈলতলী নিবাসী করিম বক্স বর্তমানের বহু পরিচিত কবি। আনোয়ারা থানার কবিয়াল ইয়াকুব আলী, কবিয়াল রাইমোহন বড়ুয়া, কবিয়াল সাবের সরকার। মনীন্দ্র দাস (করিম বক্সের শাগরেদ) প্রমুখ অনেক কবিয়াল চট্টগ্রামের মুখোজ্জ্বল করেছেন। আমার একটি ধারণা উত্তর চট্টগ্রামে যেমন পুঁথিকারের জন্মস্থান, দক্ষিণ চট্টগ্রাম তেমন কবিয়ালের প্রসূতি। উত্তর চট্টগ্রামে কবিয়াল নেই এ রকম দুঃসাহসিক কথা আমি বলতে চাই না। তাছাড়া আমার একার পক্ষে কোন চূড়ান্ত মত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

কবিয়াল যে পরিবেশে কবিগান শুরু করে তার একটি ভাষাবিচিত্র অঙ্কন করা যায়। কোন বড় লোকের বাড়ীতে বিয়ে উপলক্ষে উঠানে বা নিকটস্থ খোলা ময়দানে শামিয়ানা টাঙ্গিয়ে মাঝখানে দু'জন কবির সাথে কবিতার লড়াই চলে, সে রকম একটি মঞ্চ। চারিদিকে লোকের বসার জন্য ফরাস বিছানো। দুই পাশে দোহারীদের বসার স্থান। কবিয়াল উঠে প্রথম বন্দনা শুরু করেন ঃ

প্রভুরে, পশ্চিমে মানব আমি মক্কা হিন্দুস্থান
তার পশ্চিমে মানব আমি বরবল্লা ময়দান।

তার পশ্চিমে মানব আমি কুয়ারে আজম
সেই কুয়াতে গোসল করে হাসন আর হোসন।

এভাবে কবিতার লড়াই শুরু হয়। শুরুতেই একটি ঘোষা দিয়ে লড়াইর উৎঘাটন হয়। বোলও জুরি তাল মেলা সরগরম হয়ে উঠে। বিভিন্ন রকমের ঘোষা আছে, প্রত্যেক ঘোষা অর্থব্যঞ্জক নয়। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, প্রেমের কথা নয়, রসের কথা সেখানে ইঙ্গিত করা হয়। নীচে কয়েকটি ঘোষা দেওয়া গেল ঃ

১. কন বুঝ বুঝিলি মন, ভাল নয় ভাল নারে
লেখক খেলার মন লাছন্ত দরিয়ার মাঝে।

২. দাঁতে মিসি নাকে নথ কপালে পুথানি,
কে তোরে সাজাইল কমিলিনি।

৩. পান খাইতে সুপারী লাগে, আর অ লাগে চুন
থেকে থেকে জ্বলে আমার বিচ্ছেদের আগুন।

পূর্বেই বলা হয়েছে আমাদের দেশে (চট্টগ্রামে) কবিয়াল রমেশ শীল বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তিনিই একমাত্র কবিয়াল যিনি রাজনৈতিক কারণে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। একমাত্র তাঁর কবিতার মধ্যেই দেশের রাজনৈতিক সত্তা নিহিত হয়েছিল। সে রকম একটি কবিতা উদ্ধৃত করা হলো।

ভাষার জন্য জীবন হারালি
বাঙালী ভাইয়ে রমনার মাঠ রক্তে ভাসালি,
ভাইরে, বাঙালীদের বাংলা ভাষা জীবনে মরণে
মুখের ভাষা না থাকিলে জীবন রাখি কেনে।

কবিয়াল করিম বখশ

কবিয়াল করিম বখশ (১৮৭৯ - ১৯৩৮) চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার বৈলতলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম আব্দুল আলী, মাতার নাম দোল্লজান বিবি। দরিদ্র কবির পরিবারে জন্ম বলে কবিয়াল তেমন লেখাপড়ার সুযোগ পান নাই। সন্দ্বীপ নিবাসী আজগর আলী নামে এক রাখাল পার্শ্ববর্তী খাপরিয়া গ্রামে বসতি করে এবং আশেপাশের গ্রামে কবি গান গায়। এই কবিয়াল আজগর আলী করিম বখশকে কবি গানে অনুপ্রাণিত করে। করিম বখশের কণ্ঠের মধ্যে এমন মোহিনী শক্তি ছিল যে তাতে গ্রামের নিশ্চলানন্দ অবধূত (গৃহী নাম নন্দলাল দাস) মুগ্ধ হন এবং তাঁর পুত্র মণীন্দ্র দাস করিম বখশের শিষ্য হন। সেই নিশ্চলানন্দের কথাই করিম বখশ ছন্দ ও সুরে গেঁথে দিতেন এভাবে ঃ

এক সোনার তৈয়ারী অলংকার
কেউ গড়েছে দুল নক্ষত্র কেউ গড়েছে কণ্ঠহার।
কেউ বা পিতা, কেউ বা মাতা কেউবা বন্ধু কেউবা ভ্রাতা
সবার মুখে একই কথা নড়াচড়া বিধাতার ॥

কবিয়ালদের সম্বন্ধে সবচেয়ে অসুবিধার ব্যাপার এই যে, তাঁরা মুখে মুখে কবিতা রচনা করেন। সেগুলো ছাপার অক্ষরে না থাকায় এর মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না, তাঁদের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করার কোন সুযোগ হয়না। বুদ্ধিজীবি সমাজের সাথে যোগাযোগ থাকায় রমেশ শীলের গানগুলো সংরক্ষিত আছে। এজন্য তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে সুবিধা আছে। বর্তমানে কবিয়াল

ইয়াকুব আলী কবিয়ালদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁর জনপ্রিয়তা এতবেশী যে তিনি এখন এক নামেই পরিচিত। চট্টগ্রাম কবিয়াল সমিতির তিনিই সভাপতি। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার বিনপুর গ্রামে ১৯৩১ সালে কবিয়াল ইয়াকুব আলীর জন্ম। পিতার নাম রহিম বখ্‌শ ও মার নাম মায়মুনা খাতুন।

কবিয়াল ইয়াকুব আলী আধুনিক কালের জনপ্রিয় কবিগান গায়ক। তিনি (১) চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় পল্লীগীতি, (২) চাট-গাঁয়ের আঞ্চলিক গান, (৩) মন্দের ছন্দ (ভোটের গান), (৪) বিচ্ছেদ তরঙ্গ, এবং (৫) কবিয়াল নামে পাঁচটি গানের বই প্রকাশ করেছেন। শেষোক্ত বইতে তাঁর জীবন কথা বিধৃত আছে। দেশের বর্তমান সমস্যা নিয়েও তিনি গান লিখেছেন।

লোকসঙ্গীত ও সংস্কৃতি

গ্রামের লোকদের মুখে মুখে কতকগুলো গান শুনা যায়। সেসব গানের রচয়িতা কে সঠিক বলা যায়না। কিন্তু সেগুলোর আবেদন মানুষের হৃদয়ে এত বেশী যে সে গুলো এদেশের লোকের হৃদয়ে অক্ষয় আসনলাভ করে আছে। এগুলো এদেশের জীবনযাত্রা, জীবনের নানা অবস্থা, সমস্যা, প্রেম, বিরহ, আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা, ধর্মীয় প্রেরণা — যাবতীয় অবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। দেশের সংস্কৃতি ও ধ্যান ধারণা এইসব গানের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। এক কথায় এই লোকসঙ্গীত দেশের নিজস্ব সম্পদ। এখানে গান ভাটিয়ালী, মার্ফতী, বিয়ের গান বা হাওলা, প্রবাদ প্রবচন। খেলা - ধূলার বিভিন্ন গান। প্রথম গানগুলি উদ্ধৃত করা যাক।

(১)

গয়বা বুঝাইন্যা মাছ
মেলা ছুবাইন্যা মাছ
রাধুঁনি চতুর নে মাছ ইলিশারে
ছিড়া জালে গাব দিয়া বসাইলাম খালে
সকুম মাছমুন ধাইয়া গেল উগ্যা রৈল জালে
লে মাছ ইলিশারে
ইলিশারে কুইট্যা গেল দাওৎ নাইদে ধার
হাতের ভাঙিল সোনার চুরী গলার ভাঙিল হার
লে মাছ.....
কুড়ি কাড়ি ইলিশারে ধুইবার লাগি আসে
আধাগ্যি ন উড়াইয়া নিল পেবেনের বাতাসে
লে মাছ.....
কুইঠ্যে খাইট্যে ইলিশারে মনে হয়ে কে খাই
ঘরে আছে বাল ননদী কথারে ডরাই।
লে মাছ.....

নীচের গানটি চট্টগ্রামের বহু জনপ্রিয় গান। এতে গভীর আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত আছে।

(২)

গুরু কহ কহরে
ধানেতে ধুয়ারা গুরু শর্স্যার মাঝে তেল
আণ্ডার ভিতর বাচ্চা রৈলে প্রাণী কেমতে গেল
গুরু কহ কহ.....

হিন্দু ভাই মইরা গেলে নিব গাঙের ভাটি
মুসলমান ত মইরা গেলে পাইতা দিব মাটি
গুরু কহ কহ.....
আসমান কালা জমিন কালা, কালা নদীর পানি
সকুন থাইক্যা অধিক কালা আসের বে - ইমানি
গুরু কহ কহ.....
অসার দুনিয়ার মাঝে আখেরের ইনসাফ
মওল সাহেবের ইনসাফ
জন্মাবধির গুনারে মওলা তুমি কর মাপ
গুরু কহ কহ.....

চট্টগ্রামের সংস্কৃতির চেহারা এসব গান, সুর ও ভাবের ভিতর দিয়েই প্রস্ফুটিত হয়েছে। এই সংস্কৃতির গড়ন, লালন পালন চট্টগ্রামের মাটি, প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেই উদ্ভূত। এদেশের মানুষের জীবনযাত্রা ও ধর্মীয় ধ্যান ধারণাও এই পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। উপরোক্ত গানের যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রতিধ্বনিত, তাতে প্রকৃতির পরিবেশের প্রভাব অনুভূত হচ্ছে।

নুরুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর তথ্যমূলক পুস্তক 'চট্টগ্রামের লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি' - তে হিন্দু সমাজের নানা রকম সংস্কারের কথা বলেছেন। বস্তুতঃ, সংস্কৃতিগত ভাবে চট্টগ্রামের হিন্দু ও মুসলমানের মাঝে কিছুটা পার্থক্য লক্ষিতব্য। কথার মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। যেমন নীচের শব্দগুলিতে —

মুসলমান বলে	হিন্দু বলে
ধুই আনো	পা' লি আনো
হাঁজেন্যা	হৈন্দা খালে

আউন (আগুণ)	অয়েন
কিনারদি (পার্শ্ব দিয়া)	পা'সদি
ফুউ (ফুফু, বাপের বোন)	ফি
বাউর্চিখানা (পাকঘর)	রসাইঘর।

আমি মাত্র ওটি কতক আমার জানা শব্দ উল্লেখ করলাম। এরকম আরো অনেক শব্দ আছে, যাতে প্রমাণ করা যায় মুসলমান ও হিন্দুর, এমনকি বড়ুয়াদের (বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের) পরিবেশে পার্থক্য রয়েছে। প্রত্যেকের ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান পরিবেশেই এই পার্থক্য ঘটায়।

মোহররমের সময় মুসলিম পল্লীতে তাজিয়া নির্মাণের ধুম পড়ে যায়। শহরের প্যারেড ময়দানে বহুদিন যাবৎ তাজিয়ার মেলা বসে। লাঠিখেলা হয়। বাঁশখণ্ডের আগায় চট জড়িয়ে তাকে কেরোসিন তেলে আপ্লুত করে আগুণ লাগিয়ে হাতে ঘুরায়। এরকম ব্যাপার একমাত্র চট্টগ্রাম অঞ্চলেই দেখা যায়। ঢাকায় লাঠিখেলা হয়। সরবৎ খাওয়ানো হয়। কিন্তু ধর্মে এরকম কোন অনুষ্ঠানের অনুশাসন আছে বলে জানা যায় না। 'শহরবানুর বিলাপ' মর্সিয়াটি একটি খুবই জনপ্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী শোকগাথা। এর সুর ও গাইবার অভিনব কায়দাটি চট্টগ্রামের একেবারে নিজস্ব ভঙ্গী বলে আমার মনে হয়। ১৯৩৭ সালে পরলোকগত কবি আশুতোষ চৌধুরী ও আমি এই মর্সিয়াটি সংগ্রহ করি। আশুবাবু তা 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' এ রেকর্ডের জন্য দিয়েছিলেন।

কার্তিক মাসের দিনে বাচা গেল রণে
না জানি কি হৈল বাচার সদাই উডের মনে
জোড় মন্দির সোনার পালং এখত রৈল খালি
জননীরে গেল ছাড়ি বাচা আজগর আলীরে।

চট্টগ্রামের এই 'শহর বানুর বিলাপ' এক অপূর্ব সৃষ্টি। রচয়িতার নাম হদিস করা সম্ভব হয় নি। এখনো মোহররমের মাসে অনেক মুসলিম পরিবারে এই মসিয়া গাওয়া হয়। সুরের মাধ্যমে ঋতু বর্ণনার সাথে সঙ্গতি রেখে ইহা একটি শোকের পরিবেশ সৃষ্টি করে। তখন শ্রোতাদের চোখের পানি বাতির আলোতে চক চক করতে থাকে।

বিয়ের হাওলা বা মেয়েলী গান

এবার চট্টগ্রামের আসল লোকগীতির নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। বিয়ের হাওলা মেয়েমহলের গান। অতএব, এসব সংগ্রহ করা রীতিমত শক্ত ব্যাপার। কারণ মেয়েরা শুধু তাদের মাঝে গোলাকার হয়ে বসে, মাঝখানে একটি মেয়ে নৃত্য করতে থাকে। সেখানে পুরুষ কখনও প্রবেশাধিকার পায় না। কাজেই বিয়ের গান সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমি আমার গ্রামের ভাবী শ্রেণীর মেয়েদের থেকে কিছু বিয়ের গান সংগ্রহ করেছিলাম ১৯৩৭ সালে এবং সেগুলো আমার সম্পাদিত 'পূরবী' সাহিত্য মাসিকীতে কিছু প্রকাশও করেছিলাম। সেই একই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার গীতিকা সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরীও চট্টগ্রামের কিছু লোকগীতি সংগ্রহ করেন। বস্তুতঃ আশুতোষ চৌধুরীও 'পূরবী' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক বলে পরিচিত, যদিও পত্রিকার যাবতীয় কাজ আমাকেই করতে হতো। চট্টগ্রামের পাঠানটুলী নিবাসী আবদুল নবী পণ্ডিত থেকে আমরা কয়েকটি লোকগীতি সংগ্রহ করি। আব্দুল নবী পণ্ডিত এখনো, ১৯৭৮ সালে জীবিত, বয়স ৭৩। চট্টগ্রামের পাহাড়তলী অঞ্চলের পল্লীগীতি গায়ক মোহাম্মদ নাসির

ও ফিরিঙ্গিবাজার নিবাসী মোহাম্মদ হারুন — এসব শিল্পীদের সহযোগিতায় আশুতোষ চৌধুরী ও আমি 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' এ কিছু চট্টগ্রামী লোকগীতি (যেমন মালকা বানুর হাওলা, মাইজ ভাণ্ডারী গান) রেকর্ড করেছিলাম। চট্টগ্রামের বিয়ের গানের মধ্যে মালকা বানুর হাওলাই প্রসিদ্ধ। সাহিত্যিক মাহবুব উল আলমের মতে, মালকা বানু ছিলেন চট্টগ্রামের রাউজান থানার প্রসিদ্ধ জমিদার আমির মোহাম্মদ চৌধুরীর মেয়ে। বন্দর এলাকার (শহরের দক্ষিণে) জমিদার শেরজবরদস্ত খাঁর ছেলে শেরমস্ত খাঁর সাথে এই মালকা বানুর শাদী হয়। সেই বিয়েতে বিরাট উৎসব হয়। এসব নবাবী আমলের ঘটনা। মালকা বানুকে সাধারণ মেয়েরা 'মলখা বানু' বলে। অবশ্য বিয়ের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকম হাওলা প্রচলিত আছে। এমন কি বিয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়, তরুণ তরুণীর প্রেম ঘটিত অনেক গানও মেয়েরা অন্দর মহলে গেয়ে থাকে। অবশ্য সেখানে কোন বাদ্য থাকে না। বর্তমানে ঢোলকের প্রচলন দেখা যায়। যে মেয়ে নৃত্য করে, তালের হদিস পাবার জন্যই এই ঢোলকের ব্যবহার।

দুয়ার খুলি দে মালিনী
দরজা খুলি দে মালিনী
রাত্রি পোয়াই গেলেরে
ভালা লাল একি রসের মালিনীরে।
হস্তী দৌড়াই আইস্যে দামাদ
ঘোড়া দৌড়াই আইস্যে দামাদ
মিছা কেনে মাতরে
ভালা লাল.....

—৭

দুয়ার খুলি দে মালিনী
দরজা খুলি দে মালিনী।

চট্টগ্রামের উত্তর - পূর্ব সীমায় উত্তুঙ্গ পর্বত দাঁড়িয়ে আছে। যদিও অধুনা এককালের ঘন বন অনেক পাতলা হয়ে গেছে। সেখানে অনেক বড় বড় গাছ ছিল। পাহাড় ও নদীর এমন অদ্ভুত মেলা-মেশা। নদী থেকে গাছ উঠান, কোন ভারী জিনিস উত্তোলন করা - এসবে কর্মীদের উৎসাহ ও শক্তি সঞ্চার করার জন্য নানা গান প্রচলিত ছিল। বর্তমানে যেমন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে নানা রকম 'ক্রেন' ও 'বুলডোজার' ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন সে সব কাজ মানুষই করতো। সেই সব গান বা বোলের মধ্যে যে সব কথার ইঙ্গিত আছে তাতে এক কালের সামাজিক পটভূমি উদ্ভাসিত হয়। যেমন ঃ

হেঁ হেইয়া জোর ভাই হেঁইয়া
মধুও বাইয্যা হেঁইয়া আড়াইয়া বাড়া হেঁইয়া,
কল্লাতোল হেঁইয়া জোরের কাম হেঁইয়া ॥

যখন বৃষ্টি হয় না চাষাদের জমিতে লাঙল দিতে অসুবিধা হয়। তখন পাড়ার ছেলেগুলো বৃষ্টির গান গেয়ে বাড়ী বাড়ী যায়। চাউল তোলে, শিণী মানৎ করে, অথবা গ্রামের সকলে দুপুরের প্রচণ্ড রৌদ্রে মাঠের মাঝখানে গিয়ে নামাজ পড়ে। তখন মাথায় টুপি থাকে না। ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিজ চক্ষে দেখেছি, আমার বাবার ইমামতিতে আমাদের সামনের বিলে একবার (১৯২৫ সালে) নামাজ হয়। সেই জমায়াতের নামাজ শেষ করে বাবা যখন মাঠ থেকে বাড়ীর দিকে ফিরছিলেন পথেই বৃষ্টি নেমেছিল এবং তিনি একেবারে ভিজে চুপ্‌সে গেছিলেন। পাড়ার লোকেরা যখন বৃষ্টি ডেকে গান গেয়ে যায় ঃ

আয়রে মেঘরানী
ঠেং ধুই ধুই ফেলা পানি
কেলা তলে গলা পানি
বিবি ফাতেমা খোঁজে পানি
আল্লা তুই দেরে পানি ॥

ঘুম পাড়ানী পানও যে কোন দেশের একেবারে নিজস্ব সম্পদ। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত চট্টগ্রামের ঘুমপাড়ানি গান সত্যই অপূর্ব, সুর ও অর্থের দিক দিয়েও ঃ

আ বাচা ন কাঁদিও, ন ভাঙিও গলা
কাইল ফজরে আনি দিয়ম চক বাজাইজ্যা লোলা।
চক বাজাইজ্যা লোলার ভিতর মেথরার ছা
মেথরার ছার ভুতর ভালুকের কেশ
কত দিনে দেখা পাইব মা বাপের দেশ।

অলি অলি বেল ফুলের কলি
বেল ফুলে ঘিরি রাইখ্যি আঁর বাচার বাড়ী।

ঘুমপাড়ানী গান বা ছড়াতে একটি লক্ষণ দেখা যায়। প্রায় ছড়াতে মাউ (মামু) উল্লেখ আছে। ছেলেমেদের কাছে মামার বাড়ী বড় মধুর, মামা মুসলমানদের কাছে মামু। সব সময় 'বাচার' আকর্ষণীয় কোন বস্তু নিয়ে আসছে। প্রত্যেক ঘুমপাড়ানী গানেই চট্টগ্রামের গ্রামের পরিবেশ লক্ষ্যণীয়। সেখানে শিশুর নূতন কিছু পাবার আশা দেওয়া হচ্ছে। এখন ঘুমিয়ে পড়লে ঘুমের পরে তাকে সেই জিনিষ দেওয়া হবে। 'চান' বা চাঁদ সব সময় এই পৃথিবীর লোকের কাছে আকর্ষণীয় বস্তু, 'বাচা' কে কোন কোন গায়েন পূর্ণিমার চাঁদ বলায় শিশুর স্বর্গীয় ছবিটা ফুটে উঠেছে।

প্রবাদ প্রবচন

জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে যে জ্ঞান হয় তাই প্রবাদ প্রবচন হিসাবে স্মরণাতীত কাল থেকে দেশে চালু অবস্থায় থাকে। সুর ও ছন্দের দিকে মানুষের আকর্ষণ চিরকালের, তাই প্রবাদগুলি মিলসহ দেখা যায়। অনুরূপ ঘটনা ঘটলে তখন মানুষ ঐ প্রবাদটি উচ্চারণ করে। এখানে যেসব প্রবাদ উদ্ধৃত করা গেল সবগুলোর অর্থ বলা সম্ভব নাও হতে পারে। কিছু প্রবাদ প্রবচনের ভিতরের অর্থ উপলব্ধি করা রীতিমত শক্ত ব্যাপার।

১. অমাইনসে ন বুঝে ভালা মাইনসর গতি
উন্দুরে ন বুঝে কোরাণ না পুথি

২. যদি হয় সুজন এক ঘরে নয় জন
যদি হয় কুজন নয় ঘরে নয় জন

৩. বড় বৌ বড় মাইনসর ঝি
তার মহিমা কইয়ম কি।
মাইজ্যা বৌয়ের হা তত হরা
হদাই গোষ্ঠী ভাতে মরা
ছোট বৌয়ের কৌচৎ টান
হদাই গোষ্ঠীর পরান নান্।

৪. হিন্দুর দাড়ি, মুসলমানের নারী খালকুল্যা বাড়ী
মুড়ার কুল্যা গাই
এই চার জিনিষের বিশ্বাস নাই।

একটি দেশের লোকগীতি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই অল্প পরিসরে সম্ভব না। বস্তুতঃ এই আলোচনাটি 'চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য' নামে আমার যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে তার উপর ভিত্তি করেই রচনা করেছি। প্রত্যেক প্রকারের গানের সামান্য নমুনা ও তার উপর ভিত্তি করে আলোচনা। ১৯৩৭ সাল থেকে চট্টগ্রামের যে লোকগীতি সংগ্রহ করেছি তা আমার পাণ্ডুলিপিতে আছে। তবে একথাও ঠিক, চট্টগ্রামের লোকগীতি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই বই চূড়ান্ত, এরকম কোন দাবী আমার নেই।

আলোচনা

ক. মাহমুদ শাহ কোরেশী

শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধকার ওহীদুল আলমের প্রবন্ধের ঠিক আলোচনা করতে আমি দাঁড়াইনি। অনেকটা শ্রোতামণ্ডলীর আগ্রহেই আসতে হোল এখানে। আমার উপর তাঁদের এই বিশেষ অনুগ্রহের হেতু বোধ করি এটি যে ওহীদুল আলমের মত আমিও চট্টগ্রামবাসী। অবশ্য বলা প্রয়োজন ওহীদুল আলম সাহেবের এখানে প্রবন্ধ পড়া বা রাজশাহীর এই সেমিনারে তাঁর আগমনের ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই। হাত থাকলে আমি খুশী হতাম। কিন্তু একান্তভাবে এ গৌরব আমাদের পরিচালক ডঃ আকন্দের। আমি এখানে দাঁড়িয়ে দু'টি কথা বলবো। একটি কথা হচ্ছে ওহীদুল আলম সম্পর্কে। আমার মনে হয় এখানে উপস্থিত সুধীবৃন্দের মধ্যে চার পাঁচ জন ছাড়া কেউই ওহীদুল আলম সম্পর্কে ভালভাবে কিছু জানেন না। তিনি দীর্ঘ দিনের সাহিত্যসেবী। প্রথম জীবনে কবি হিসেবে তাঁর বেশ সুনাম ছিল। তাঁর একটি গ্রন্থ 'কর্ণফুলীর মাঝি' এক কালে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। জসিমুদ্দীনের প্রায় উত্তরসূরী হিসেবেই তখন তাঁর স্থান ছিল। তা ছাড়া আরও বিভিন্ন পত্রিকায় লিখে, সাময়িক পত্র সম্পাদনা করে তিনি তাঁর নিজের এবং পরিবারের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর পরিবার — বিখ্যাত আলম পরিবারে চট্টগ্রামের আরো অনেক সাহিত্যিক রয়েছেন। সামগ্রিক ভাবে বাংলাদেশে হয়তো তাঁদের খুব বেশী পরিচয় নেই। কিন্তু চট্টগ্রামে তাঁদের পরিচিতি খুব উজ্জ্বল। তবে দুই

বাংলার মধ্যে অনেকে, বিশেষ করে যাঁরা সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে জড়িত, তাঁরা তাঁদের সবাইকে চেনেন। ওহীদুল আলম সাহেবের বড় ভাই দিদারুল আলম অকালে মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিক ছিলেন। তারপরে, মাহবুবুল আলম আমার মনে হয়, এবং আমার মত অনেকের ধারণা আমাদের কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আমি বলবো, এক ধরণের বুদ্ধিজীবিও বটে। বুদ্ধিজীবি এই অর্থে যে বুদ্ধির তিনি বেসাতি করেন না, যথাযথ ভাবে বুদ্ধির ব্যবহার করেন। সুদীর্ঘ কাল বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করে আসছেন। সামগ্রিক ভাবে তাঁর রচনা না পড়ে কেউ যেন তাঁকে বিচার করতে না বসেন। তিনি একজন ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন লেখক। এঁদের দু'জনের সাথে গত পাঁচ সাত বছর ধরে আমি ব্যক্তিগত যোগাযোগ রেখেছি। সবচেয়ে বেশী আমি মুগ্ধ হয়েছি তাঁদের মানবিকতা, বিনয়, উদারতা, এইসব গুণাবলীর জন্য, যার থেকে আধুনিক কালে আমরা খুব বঞ্চিত হচ্ছি। উদাহরণ হিসেবে আমি বলবো একটি ঘটনার কথা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আমি মাহবুবুল আলমের 'মোমেনের জবানবন্দী' কিছুদিন পড়াতাম। যখনি তাঁর কাছে খবর পাঠিয়েছি — 'আপনি আমার ছাত্রদের সামনে ক্লাসে যদি আসেন' — উনি তার পরদিনই পনের মাইল পথ বাসে চড়ে চলে এসেছেন। দুই ভাইয়ের মধ্যেই এরকম অনেকগুলো গুণ আমরা দেখতে পেয়েছি। এজন্যই এবং সব চাইতে বেশী আগ্রহ, আমাদের সেমিনারের সাথে সম্পৃক্ত যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের আঞ্চলিক ইতিহাস প্রসঙ্গে এই দুই ভাই এবং তাঁদের পরিবারের অন্যান্যরা এবং তাঁদের বিশিষ্ট বন্ধু, অগ্রজ প্রতিম সাহিত্যিক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, এঁরা সবাই চট্টগ্রামের ইতিহাস নিয়ে প্রভূত গবেষণা করেছেন। আমি বিশেষ করে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের 'ইসলামাবাদ' গ্রন্থটি প্রসঙ্গে বলবো, যে

বাংলা ভাষায় এত সুন্দর আর কোন আঞ্চলিক ইতিহাস রচিত হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে আমি খুবই সন্দিহান। কিন্তু বইটি তিনি আংশিক রচনা করে যেতে পেরেছিলেন এবং বাংলা একাডেমী তা প্রকাশ করেছে। আমার মনে হয় বইটি যদি কেউ পড়ে দেখেন তবে আমাদের আঞ্চলিক ইতিহাসের অঞ্চল বিশেষের সংস্কৃতির সৌকর্য ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত হবেন। আজকের এ আলোচনায় ওহীদুল আলম সাহেবের সংগ্রহের যে অতি ক্ষুদ্র অংশ আমরা শুনলাম, তাতে আমাদের আঞ্চলিক সাহিত্যের মধ্যে যে অনেক মণিমঞ্জুষা রয়ে গেছে সেগুলো সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করতে পেরেছি। এইভাবে প্রত্যেকটি অঞ্চলের এসব হারামণি আরও সংগ্রহ এবং এগুলো নিয়ে আরও আলোচনা ও গবেষণা করা হলে আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে।

খ. রফিকুল ইসলাম

আমি জনাব ওহীদুল আলমের প্রবন্ধের একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটি হলো, তিনি চট্টগ্রামী উপভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য তাঁর এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন। আমি মনে করি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ এই যে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা — সাধারণতঃ বিস্তৃতভাবে ধরা পড়ে লোক বচন, লোকগীতি ও লোক সাহিত্যের মধ্যে; এবং এক সময় আমি চট্টগ্রামের উপভাষার কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছিলাম। সীতাকুণ্ড থেকে আমরা শুরু করি। 'টেপ' করতে করতে আমরা প্রথমে কর্ণফুলী পর্যন্ত যাই। তারপর এদিকে রাঙ্গামাটি ওদিকে টেকনাফ পর্যন্ত, উনি যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলেছিলেন সুন্দর ভাবে সেগুলো ধরা পড়ে তার মধ্যে। সীতাকুণ্ড

অঞ্চলে নোয়াখালী উপভাষার যে প্রভাব, তা কর্ণফুলী পর্যন্ত এক রকম, তারপরে কর্ণফুলী থেকে শঙ্খ পর্যন্ত আর এক রকম। শঙ্খের ওপার থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত আর এক রকম। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বাঁশখালীর ওদিক আর এক রকম। চট্টগ্রামের উপভাষার যে বৈচিত্র্য দেখে আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল, আমাদের বাংলাদেশে যে কতকগুলো উপভাষা, বিশেষ করে চট্টগ্রাম সিলেট নোয়াখালীতে রয়েছে, এগুলোকে ঠিক উপভাষা বললে ভুল হবে। আমি এটা ঠিক বিশ্লেষণ করে কথা বলছি না, আমার একটি অনুভূতি থেকে কথাটা বলছি। মনে হয় যেন ওগুলো প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা এবং যখন আমাদের এই নাগরিক বাংলা ভাষা যখন তারা ব্যবহার করে তখন তাদের এটা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিখতে হয়? এটা আমার অনুভূতি। এটা বাংলাদেশের অনেক জায়গায় আমি দেখেছি, যে আমাদের মাতৃভাষা হচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা এবং চলতি বাংলা — সেটা প্রায় আমাদের দ্বিতীয় ভাষা। এটা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। ঐদিন সুনীতি বাবুর একটা মন্তব্য আমার চোখে পড়লো। দেখে আমার ভাল লাগলো। সুনীতি বাবু বলেছিলেন ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারো হাজং অঞ্চলের একটি চাষার যে ভাষা — বাঁকুড়া অঞ্চলের একটি চাষার যে ভাষা — আসলে সেটা বাংলা নয়, আসলে সেটা হচ্ছে সেই বোরো অষ্ট্রিক বা গারোদের ভাষা, তার উপরে কিছুটা বাংলার ছাপ পড়েছে। যেটা তিনি বলতে চাচ্ছিলেন, আসলে আর্য ভাষা বা বাংলা ভাষা এই অঞ্চলে আসবার পূর্বে এই অঞ্চলে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই সব ভাষা আমাদের আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে রক্ষিত বা বিধৃত; এবং সেইসব বৈশিষ্ট্য সম্ভবতঃ আমাদের লোকসাহিত্যের মধ্যে অনেকটা ধরা পড়েছে।

আজ আমাদের এখানে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে, সংস্কৃতির ইতিহাস নিয়ে, ঐতিহ্য নিয়ে। ভাষাকে নিয়েও একটা সমস্যা। সত্যি বাংলা ভাষার অতীতটা কি? এটা আমরা জানি যে বাংলা ভাষা একটা আর্য ভাষা। বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ কি ছিল, প্রত্ন রূপ কি ছিল, এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে সংগ্রহ করে, সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে, এবং তার ভিত্তিতে প্রত্ন বাংলাকে পুনর্গঠন করে আমরা সেই বাংলা ভাষার জাতীয় রূপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হইনি। এখনও বাকী আছে। এবং এই ধরণের লোক সাহিত্য সংগ্রহ যা ওহীদুল আলম করেছেন, তার মধ্য দিয়েও সে কাজ আমরা অনেকটা করতে পারি। এ ধরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ অত্যন্ত রসালো প্রবন্ধ এখানে পরিবেশ করার জন্য আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

গ. আবু তালিব

এই রকম কতকগুলো বুলি আছে যা অন্য দেশে গালি হিসেবে পরিচিত। আমরা এইসব আঞ্চলিক ছড়া যদি না জানি তবে আমাদের অসুবিধা হবে এবং সেটা বুঝতেও পারবো না। তারপরে লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে ওহীদুল আলম সাহেব আলোচনা করলেন, মাইজ ভাণ্ডারী গান, সে গানের সাথে আমাদের দেশের লালন ফকিরের গান বা বাউল মুর্শিদী গানের মিল আছে। এটা থাকবে। কিন্তু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তাকে বিশিষ্টতা দেবে এবং সেজন্যই আমাদের আঞ্চলিক ভাষাও শিখতে হবে। সেসব গানের অশ্লীল ইংগিতের কথা উনি

বলেছেন, এ রকম সব জায়গাতেই আছে। দেবর এবং ভাবীর সম্পর্ক নিয়ে যে গান আছে তাতে এসব কথাও আছে যে "ভোদকা গড়ে কালির খোটা। যা বে কোন গমের বেটা", এ ধরণের ইঙ্গিত আছে। সেইজন্য আমাদের লোক সংস্কৃতি ও তার ভাষা জানা বিশেষ প্রয়োজন। ওহীদুল আলম সাহেব সুদূর চিটাগাং থেকে এসে তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ শোনালেন এবং এখানে চিটাগাং এর প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির যে উপহার আমাদেরকে দিলেন তার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সেই সাথে ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আধুনিক বাংলা কবিতায় ভিন্ন স্বরের সাধনা

রফিকুল ইসলাম

ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা আবর্তিত হয়েছে জগৎ ও জীবন, প্রেম ও প্রকৃতি, রূপ ও সৌন্দর্য নিয়ে আর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা মুক্তি খুঁজছে অধ্যাত্মলোকে, যদিও ঊনিশ শতকের 'কড়ি ও কমল', 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা'র অতি রোমান্টিকতা থেকে বিংশ শতাব্দীর 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলী'র আধ্যাত্মিকতাকে পৃথক করেছে 'ক্ষণিকা'র সহজ সৌন্দর্য, অনায়াস ছন্দ, ঘরোয়া ভাষা, আটপৌরে জীবন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কবি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি প্রতিভার যে নানা উন্মেষ দেখি, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সে প্রতিভা বিশ্রাম গ্রহণকারী। রবীন্দ্রনাথের কাব্য কর্ম আলোচ্য সময়ে 'খেয়া' (১৯০৬), 'শিশু' (১৯০৯), 'গীতাঞ্জলি'র (১৯১০) আধ্যাত্মিক ও দার্শনি অভিজ্ঞতায় নিবিষ্ট, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই শতকের রোমান্টিকতার পর রবীন্দ্রনাথের আবেগ ভিন্ন স্তরে উৎসারিত। তবে 'খেয়া'র আধ্যাত্মিকতা বা 'গীতাঞ্জলি'র নিবেদিতচিত্ততার ব্যতিক্রম বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুর সৃষ্টি 'চৈতালী' (১৯১২),

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।

পরিপূর্ণ বেদনার ভার
মুহূর্তেই দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল।
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল ॥

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের পরবর্তী সৃষ্টি 'বলাকা' কাব্য (১৯১৬)। 'বলাকা' প্রথম মহাযুদ্ধ সূচনাকালীন কাব্য। এ কাব্যে কবির অভিজ্ঞতা কেবল গতিময় নয়, অস্থিরও বটে। 'বলাকা'র ছন্দ শুধু মুক্ত নয়, সুনির্দিষ্ট স্তবকবন্ধনও বহু কবিতায় পরিত্যক্ত। বিশ্বের মূল্যবোধ, ভাবজগৎ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রথম মহাযুদ্ধ-কালীন পরিবর্তনের সূচনা রবীন্দ্র সাহিত্যে ঘটে 'বলাকা' কাব্যের মাধ্যমে। 'বলাকা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতায় বেগের আবেগ সঞ্চারিত হতে দেখি,

মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশেহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

কিন্তু বলাকায় কবির আবেগ কেবল একটি নির্দিষ্ট পথে সঞ্চরণশীল নয়, কবির সৃষ্টি প্রতিভা এ কাব্যে কেবল সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে নিঃশেষিত নয়, তত্ত্ব ও দর্শনের জগৎ থেকে সমকালীন বাস্তবতায় কবি নেমে এসেছেন এবং তা ঘটেছে মহাযুদ্ধের কারণেই। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়,

> এই কবিতা (শঙ্খ) যে সময়কার লেখা তখনো যুদ্ধ শুরু হতে দু মাস বাকি আছে। তারপর শঙ্খ বেজে উঠেছে; ঔদ্ধত্যে হোক, ভয়ে হোক, নির্ভয়ে হোক, তাকে বাজানো হয়েছে। যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বার স্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে একটি সার্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। তা শেষ হয়ে স্বর্গারোহণ পর্ব এখনো আরম্ভ হয়নি। আরো ভাঙবে, সঙ্কীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখনো পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবী কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে, যে কাল সর্বজাতির লোকের। চাকভাঙা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে, আবার নূতন করে চাক বাঁধতে। শঙ্খের আহ্বান তাদের কাছে পৌঁছেছে।

'বলাকা'র এক শ্রেণীর কবিতা রচনার সময় রবীন্দ্র চিত্ত উপলব্ধি করেছিল যে মানবজাতি এক যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত, একটা অতীত রাত্রির অবসান হয়ে এসেছে, দুঃখ বেদনা আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নবযুগের রক্তাক্ত অরুণোদয় আসন্ন। এই চেতনার উদ্বেগ থেকেই শঙ্খধ্বনিতে আহ্বান জানিয়েছেন কবি,

তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে
কেমন করে সইব,
বাতাস আলো গেল মরে,
এ কী রে দুর্দৈব!
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্‌না গেয়ে,
চলবি যারা চলরে ধেয়ে,
আয় না রে নিঃশঙ্ক ॥

বলাকায় নবীনের, যৌবনের, সবুজের আবাহন যে সব কবিতায় তার অনেকগুলোই লেখা হয়েছিল ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ - পত্রে'র তাগিদে। "সবুজের অভিযান" কবিতায় নবীন, কাঁচা, সবুজ আর 'অবুঝদের' প্রতি তিনি 'রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে' 'আধমরাদের ঘা মেরে' বাঁচাতে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন,

শিকলদেবীর ঐ — যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া।
পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন, বিজয় - কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্‌রে বাছা - বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা ॥

'বলাকা' কাব্যে 'সর্বনেশে', 'আহ্বান', 'শঙ্খ', "গাড়ি" প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় আসন্ন ঝড়ের আভাস, মত্ত সাগর গাড়ি দেবার

সঙ্কেত। "আবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো / রক্ত মেঘে ঝিলিক মারে / বজ্র বাজে গহন পানে" কিংবা "মত্ত সাগর দিল গাড়ি গহন রাত্রি কালে / ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে" প্রভৃতি চরণে ঐ আবেগেরই প্রকাশ। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় এ আবেগই পরিণতিতে পৌঁছেছে,

দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।

অথবা

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?

'বলাকা' কাব্যে এই যে ভিন্ন সুর তা অবশ্য রবীন্দ্র কাব্যে একেবারে অভিনব বা অভাবিত নয়। 'মানসী' থেকেই আমরা তার উপস্থিতি লক্ষ্য করি। উদাহরণ স্বরূপ ঐ কাব্যের 'দুরন্ত আশা' কবিতাটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যে কবিতায় ভদ্র, শান্ত জীবন, পোষ মানা প্রাণ, শান্তিপ্রিয় অলস শিষ্ট গৃহপালিত বাঙ্গালী জীবনের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে আক্ষেপের স্বরে কবি বলেছিলেন,

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন।
চরণ — তলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবন স্রোত আকাশে চালি
হৃদয় — তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছে নিশিদিন —
বরশা হাতে, ভরসা প্রাণে
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধা হীন।

'মানসী' কাব্যের 'দুরন্ত আশা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ঐ ইচ্ছাকে যদি রোমানটিক কামনা বলে চিহ্নিত করে অধিক মূল্য দেয়া না হয় তা হলেও 'চিত্রা' কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় আমরা তাঁর ঐ চেতনাকে আরও অগ্রসরমান দেখি। যেখানে কবি বলেছেন,

কবি, তবে উঠে এসো — যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা — সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য আনন্দ — উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। ঐ দৈন্য মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি॥

বাস্তব সমস্যার সমাধানে কবি স্বর্গ হতে বিশ্বাসের যে ছবি নিয়ে আসতে চেয়েছেন, তার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই 'নৈবেদ্য' কাব্যেও যেখানে তিনি মঙ্গলময়ের কাছেই এ দুর্ভাগ্য দূর করে দেবার প্রার্থনা জানাচ্ছেন,

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
এ চিরপেষণ যন্ত্রণা, ধূলি তলে
এই নিত্য অবনতি, দাও পলে পলে
এই আত্ম অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ভ্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্য-মর্যাদাগর্ব চিরপরিহার—

বরং 'গীতাঞ্জলি'র 'অপমানিত' কবিতায় কবির সমাধান বাস্তবোচিত, আধ্যাত্মিকতার আবরণে বা প্রার্থনায় আবেদনে তা অস্পষ্ট নয়, পরোক্ষ নয়,

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

'বলাকা' কাব্যে প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনা কিন্তু বিভ্রান্ত হয়নি। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন "শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই

চিরন্তন এক"। কবিতাটির শেষ চরণে তিনি "দেবতার অগার মহিমা" কামনা করেছেন। বলাকার শঙ্খ তো বিধাতারই আহ্বান শঙ্খ, রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধ অকল্যাণের সঙ্গে, পাপের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমস্ত বিরোধের অবসান অনন্তের মধ্যে আর কেবল মাত্র ধর্মই মানুষকে সমস্ত দ্বন্দ্বের তুফান পার করে দিয়ে অদ্বৈতে, অমৃতে আনন্দে প্রেমে উত্তীর্ণ করতে সক্ষম। আমাদের বাস্তব জীবনের মাটির পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যার যে আধ্যাত্মিক সমাধান রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেন এবং বাংলা কবিতার যে রীতি রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেন কয়েকজন সমসাময়িক ও পরবর্তী কবির কাছে তা গ্রাহ্য হয়নি। আমরা প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলামের কথা বলছি। বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী কেবলমাত্র গদ্য শিল্পী হিসেবে চলতি ভাষার রীতির জন্যই উল্লেখযোগ্য নন, সনেট রচয়িতা হিসেবে তিনি বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রেখেছেন। তাঁর দুটি সনেট সঙ্কলন 'সনেট পঞ্চাশত' (১৯১৩) এবং পদ-চারণ' (১৯১৯)। প্রমথ চৌধুরী সমকালীন বাংলা কবিতা সম্পর্কে সমালোচনা মুখর ছিলেন, এবং সে কারণেই তিনি সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সুকুমার সেনের ভাষায়,

> সমসাময়িক বাঙ্গালা কবিতার (রবীন্দ্রনাথ ছাড়া) কৃত্রিম ভাবালুতা, গতানুগতিক প্রকৃতি বর্ণনা অথবা বইপড়া তত্ত্বকথার নিরর্থ শব্দপ্রচুর ভাষার এবং শিথিল সাহিত্য কর্মের বিরুদ্ধে প্রমথ বাবুর প্রতিক্রিয়া ও আপত্তি এই কবিতাগুলিতে প্রকাশিত। শব্দ চয়নের শ্রম সাধ্য নিপুণতায় ভাষা ও ভঙ্গীর কঠিন দীপ্তিতে এবং রচনা বন্ধের গাঢ়তায় প্রমথ বাবুর সনেটগুলি নূতন স্বাদ বহন করিয়া আনিল। ভাষায় গদ্যের ভারবহতা দেখা দিল।

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের মত কবিতারও বৈশিষ্ট্য ছিল ভাষা এবং তীর্যক দৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে বলেছেন 'ইস্পাতের ছুরি', 'সরস্বতীর বীণায় তিনি ইস্পাতের তার চড়িয়ে ছিলেন।' প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'পদ - চারণ' উৎসর্গ করেছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে। উৎসর্গ পত্রে তিনি যা লিখেছিলেন তার থেকে প্রমথ চৌধুরীর কবিতার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

> গদ্যের কলমে লেখা এই পদ্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ, আমার বিশ্বাস, এগুলির ভিতর আর কিছু না থাক, আছে rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ reason
>
> এর প্রথমটি যে পদ্যের এবং দ্বিতীয়টি গদ্যের বিশেষ গুণ এ সত্য আপনার কাছে অবিদিত নেই; সুতরাং আশা করি, আমার এ রচনা আপনার কাছে অনাদৃত হবে না।

ছন্দের সঙ্গে যুক্তির পারম্পর্যের অভাবে সমকালীন বাংলা কবিতায় যে অগভীর ভাব উচ্ছ্বাস এবং গতানুগতিকতার পুনরাবৃত্তি চলছিল সে সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন। 'সনেট-পঞ্চাশত' গ্রন্থের "উপদেশ" সনেটটিতে তাঁর সে মনোভাব ধরা পড়েছে,

> প্রিয় কবি হতে চাও, লেখো ভালবাসা
> যা পড়ে' গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
> তার লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন,—
> জোর - করা ভাব, আর ধার করা ভাষা।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক লক্ষ্য ছিল, সাহিত্যে আবেগের সঙ্গে মননের যোগাযোগ সাধন, বুদ্ধিবৃত্তির ছোঁয়া, আত্মিক চেতনা, সাহিত্যের ভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি আনয়ন করা। তাঁর কবিতাও ঐ পরিকল্পনার অন্তর্গত ছিল। পূর্ব উদ্ধৃত 'উপদেশ' সনেটটি সম্পর্কে

তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকল পড়ে বিরক্ত হয়েই তিনি সনেট রচনায় হাত দিয়েছিলেন। সমকালীন কবিতার গতানুগতিকতা ও একঘেয়েমীর প্রতি তাঁর বিরক্তির পরিচয় তাঁর একাধিক কবিতায় আছে, যেমন 'কবিতা লেখা' সনেটটি, এই কবিতাটি গদ্যে রূপান্তরিত করলে তার অর্থ দাঁড়ায়, এ যুগে কবিতা লেখা কঠিন, কবিরা নিজের দেখা পায় না, মন ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে নিজ ধনে নিজেই ফাঁকিতে পড়ে। তারা গলা চেপে প্রেমের গান গায়, প্রাণের তান ভয়ে ছাড়ে। সুরুচি সুনীতি হল যুগল চেড়ী, কল্পনার চরণে বেড়ি পড়ায়। কবিতাটির শেষাংশ,

> কবিতা কয়েদী, রাধার মত
> দায়ে পড়ে করে গৃহিনী ব্রত।
> বাঁশী বাজে বনে বসন্ত রাগে
> জটিলা কুটিলা দুয়ারে জাগে।

প্রমথ চৌধুরী ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ সনেটটি রচনা করেন। তাতে বোঝা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে ও অনুকরণ রচিত কবিতার সম্পর্কে এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শুরুতেই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। 'দুয়ানি' সনেটে তিনি বলেছেন "প্রাণহীন কবিদের বীণার ঝঙ্কার / বাণহীন ধনুকের ছিলার টঙ্কার" মনে হয় সমকালীন কবিতা সম্পর্কেই প্রমথ চৌধুরীর উপরোক্ত মন্তব্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, যদিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আর্য গাথা' (দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৯৩), 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯) এবং 'মন্দ্র' (১৯০২) কে বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথের ঐসব আলোচনায় দৃষ্টি

ছিল সপ্রশংস। 'আর্যগাথা' সঙ্গীত পুস্তক কিন্তু নিছক গীতি সঙ্কলন নয়, কীর্তনে যেমন কবিতা ও গানের সমন্বয়, 'আর্যগাথা'র কিছু গান তেমনি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

> আর কতকগুলি গান আছে যাহা কাব্য হিসাবে সম্পূর্ণ, যাহা পাঠ মাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সৌন্দর্যের সঞ্চার করে। যদিচ সে গানগুলির মাধুর্যও সম্ভবতঃ সুর সংযোগে অধিকতর পরিস্ফুটতা গভীরতা এবং নূতনত্ব লাভ করিতে পারে, উদাহরণ স্বরূপ একবার দেখে যাও, দেখে যাও কত দুখে যামি দিবা নিশি কীর্তনটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। ইহা বেদনায় পরিপূর্ণ, অনুরাগে অনুনয়ে পরিপ্লুত। পাঠ করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে ইহার আকুতিপূর্ণ সঙ্গীতটি আমাদের কল্পনায় ধ্বনিত হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য প্রবন্ধে গান এবং কবিতার প্রভেদ বোঝাবার জন্য 'আর্যগাথা' থেকে কবিতার নিদর্শনরূপে "সে কে? — এ জগতে কেহ আছে, অতি উচ্চ মোর কাছে / যার প্রতি তুচ্ছ অভিলাষ", এবং গানের উদাহরণ স্বরূপ 'ছিল বসে সে কুসুম কাননে' উদ্ধৃত করে শেষোক্ত কবিতাটির রসকে গীতরস আখ্যা দিয়েছেন। আর্য গাথার আর একটি রচনা "হরষে বরষ পরে যখন ফিরি রে ঘরে / সে কে রে আমারি তার আশা করে রহে বলো;" "কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সুর না থাকিলেও গান'। ইহাতে কোনো রাগিনীর নির্দেশ না থাকিলেও ইহা গান।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আষাঢ়ে' হাস্যরস প্রধান এবং কখনো কখনো গল্প আকারে রচিত কবিতা সঙ্কলন। রবীন্দ্রনাথ এই সব কবিতা সম্পর্কে বলেছেন,

> গল্প প্রসঙ্গে সামাজিক কপটতার যে অংশটাই কবির হাতের কাছে আসিয়াছে সেইখানেই তিনি একটুখানি সহাস্য

টিপ্পনি প্রয়োগ করিয়াছে এরূপ প্রকৃতির রহস্য কবিতা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং 'আষাঢ়ে'র কবি অপূর্ব প্রতিভাবলে ইহার ভাষা ভঙ্গী বিষয় সমস্তই উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছেন।

বস্তুতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আষাঢ়ে' তাঁর হাসির গানের অনুশীলনী সামাজিক বিষয় নিয়ে হাস্য কৌতুক ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক গান বা কবিতার যে ভাষা, ভঙ্গী ও সুর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রবর্তন করেন পরবর্তীকালে নজরুলের 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থে আমরা তা অনুসৃত হতে দেখি। 'আষাঢ়ে'র ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ভূমিকায় লিখেছেন 'এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সঙ্গত'। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐ স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায় যে তিনি সচেতন ভাবেই গদ্যের ভাষাকে কবিতার ভাষায় ব্যবহার করতে সচেষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উক্ত গ্রন্থের সমালোচনায় ভাষা সম্পর্কে সম্মতি জানিয়েছেন তবে 'গদ্যকে সমিল গদ্য রূপে' চালাবার চেষ্টাকে সমর্থন করতে পারেন নি। যদিও ছন্দ এবং মিলের ওপর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের যে দখল তার প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> কবি নিজেই তাঁহার অপেক্ষাকৃত পরবর্তী রচনাগুলিকে নিয়মিত ছন্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে স্থায়িত্ব এবং উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালি মহিমা, ইংরাজ স্তোত্র, ডিপুটি কাহিনী ও কর্ণ বিমর্দন সর্বত্র উদ্ধৃত পঠিত ও ব্যবহৃত হইবার পক্ষে অনুকূল হইয়াছে। এই লেখাগুলির মধ্যে যে সুনিপুণ হাস্য ও সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আছে তাহা শাণিত সংযত ছন্দের মধ্যে সর্বত্র ঝকমক করিতেছে।...'আষাঢ়ে'র গ্রন্থকর্তাও যে কতকগুলি কবিতা

> লিখিয়াছেন সকলের মধ্যে তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়তা প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু যে কবিতাগুলি তিনি ছন্দের পুরাতন ছাঁচের মধ্যে নূতনত্বের উজ্জ্বলতা ও পুরাতনের স্থায়িত্ব উভয়ই একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। ... সমালোচ্য গ্রন্থে বাঙ্গালি মহিমা কর্ণবিমর্দন কাহিনী প্রভৃতি কবিতায় যে হাস্য প্রকাশ পাইতেছে তাহা লঘু হাস্যমাত্র নহে, তাহার মধ্যে হইতে জ্বালা ও দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং ধিক্কারের দ্বারা তাহা গৌরব বিশিষ্ট।

'আষাঢ়ে' গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কৌতুক, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপের প্রকাশকে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছেন আর 'মন্দ্র' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ কবির শব্দ নির্বাচন, ছন্দরচনা এবং ভাববিন্যাসের যে সাহস তার প্রশংসা করেছেন। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৌলিক অবদান নির্দেশ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> দ্বিজেন্দ্র লাল বাবু বাংলা ভাষার একটা নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিভা সম্পন্ন লেখকের সে কাজ। দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু বাংলা কাব্যভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতি শক্তি। ... ছন্দ সম্বন্ধেও যেন স্পর্ধাভরে কবি যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার আশীর্বাদ ও উদ্‌বোধন কবিতায় ছন্দকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উড়াইয়া দিয়া ছন্দ রচনা করা হইয়াছে। তিনি যেন সাংঘাতিক সংকটের পাশ দিয়া গেছেন — কোথাও যে কিছু বিপদ ঘটে নাই তাহা বলিতে পারিনা। কিন্তু এই দুঃসাহস কোনো ক্ষমতাহীন কবিকে আদৌ শোভা পাইত না।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আর্যগাথা', 'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের যে ভূমিকা তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ সপ্রশংস হলেও বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত তাঁর জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক বা উদ্দীপনামূলক সঙ্গীতগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোন মন্তব্য করেননি। অন্যদিকে কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-বিলাস, প্রতীক ও ব্যঞ্জনার রহস্যলীলা, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অধ্যাত্ম দৃষ্টিভঙ্গী দ্বিজেন্দ্রলালের ভাল লাগেনি। বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০৪) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক একটি রচনা ছিল, তাতে তিনি তাঁর কবিতায় তাঁর অভিজ্ঞতার যে বিকাশ তার পরিচয় দেন। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক শক্তির প্রেরণা দাবী করার 'দম্ভ ও অহমিকায়' দ্বিজেন্দ্রলাল স্তম্ভিত হয়েছিলেন (কাব্যের উপভোগ, বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৪)। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'সোনার তরী' কবিতার একটি 'প্যারডি'ও প্রকাশ করেন। কবিতাটির বিভিন্ন সমালোচক প্রদত্ত রূপক ব্যাখ্যাকে আক্রমণ করে 'প্যারডি'র সঙ্গে একটি আলোচনাও তিনি প্রকাশ করেন (একটি পুরাতন মাঝির গান, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, সাহিত্য, আশ্বিন ১৩১৩)। রবীন্দ্রকাব্য ব্যাখ্যাকার অজিত কুমার চক্রবর্তীর 'কাব্যের প্রকাশ' (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৯১৩) নামক একটি আলোচনার সমালোচনা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর কাব্যের অভিব্যক্তি প্রবন্ধে 'সোনার তরী' কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

> পরের ভাষায় পরের দেশের সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য কবির প্রায় সর্বাপেক্ষা দুবোধ্য কবিতা (Ode on the Immortality of the Soul) বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার মাতৃভাষায় আমার বাঙ্গালী ভ্রাতার কবিতা বুঝিতে গলদঘর্ম হইতে হয়। এই যদি ইহাদের বৃহৎ ভাবের ফল হয় ত বলিতে হইবে যে, সে ভাব বড়ই বৃহৎ। কারণ এ কবিতাটি দুর্বোধ্য নয়, অবোধ্যও নয়— একেবারে অর্থশূন্য স্ববিরোধী। ... অস্পষ্ট হইলেই গভীর হয় না। কারণ ডোবার পঙ্কিল জলও অস্পষ্ট; স্বচ্ছ হইলেও shallow বা অগভীর হয়না কারণ সমুদ্রের জলও স্বচ্ছ; অস্পষ্টতা লইয়া বাহাদুরি করিয়া miraculous দাবী করিয়া, ব্যঙ্গ করিবার কারণ নাই। অস্পষ্টতা একটা দোষ, গুণ নহে।

রবীন্দ্রকাব্যে অস্পষ্টতার অভিযোগ তুলেই দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষান্ত হননি, তিনি "কাব্যে নীতি" (সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬) নামক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানগুলিকে তিনি ইংরেজী কোর্টশিপের কিংবা লম্পটের বা অভিসারিকার গান বলে উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যটির বিরুদ্ধে একই প্রবন্ধে তিনি দুর্নীতি ও অশ্লীলতার অভিযোগ উত্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের প্রশংসা করলেও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'আনন্দ বিদায়' নামক একটি ব্যঙ্গ নাটকে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গান সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের যে বিরূপতা তার অনেকটাই হয়তো ব্যক্তিগত কিন্তু সবটা নয়, দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক মনোভঙ্গীও এ জন্যে অনেকটা দায়ী। দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যে স্পষ্টতার পক্ষপাতী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক রহস্যময়তা ও আধ্যাত্মিক অস্পষ্টতার তিনি বিরোধী ছিলেন। বস্তুসত্য ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাই তাঁর কাছে সত্য ছিল, প্রমথ চৌধুরী ও সত্যেন্দ্রনাথ

দত্তের মধ্যেও এই দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্য রীতি ও প্রকাশভঙ্গীতে যুক্তি, বুদ্ধি ও বিতর্কের যে প্রাধান্য দেখা যায় উত্তর সাধক যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তে তা উপস্থিত। নজরুল উদ্দীপনামূলক বা হাসির গান ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পাহাড়' কবিতার ছন্দে 'খাতিল আরব' রচনা করেছিলেন।

শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে আমরা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য শক্তির মুখ্য বিকাশ লক্ষ্য করি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৌলিক কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ যে তিনটি গ্রন্থে 'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২) ও 'তুলির লিখন' (১৯১৪) এ সময়ে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম কাব্য পুস্তিকা 'সবিতা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। 'সবিতা'র শেষ কবিতা 'সাম্যসাম' বাংলা কবিতায় বিংশ শতাব্দীর আগমন বার্তা ঘোষণা করে। আধুনিক বাংলা কবিতায় সাম্যের মন্ত্র ঘোষিত হয় সোচ্চার ভাবে ঃ

কে আছ আজিকে অবনত মুখে, পীড়িত অত্যাচারে ?
কে আছ ক্ষুণ্ণ, কেবা বিষণ্ণ, অন্যায় কারাগারে ?
... ...
ঘনির তিমিরে, কারা কি কহিছে, ওগো শোন পাতি কাণ
অনেক নিম্নে পড়ি আছে যারা শোন তাহাদের গান
... ...
যারা প্রাণপাতে কঠিন মাটিতে ফলায় ফসল ফল
তারা আছে শুধু খাটিয়া বহিয়া ফেলিবার শ্রমজল
জগতে এসেছে নূতন মন্ত্র বন্ধন ভয় হারী
সাম্যের মহাসঙ্গীত সব গান মিলি নরনারী।

আমরা মানিনা মানুষের গড়া কল্পিত যত বাধা,
আমরা মানিনা বিলাস - লালিত ঘোড়ার আরোহী গাধা।
মানি না গির্জা, মঠ, মন্দির, কল্কী পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য দেবতা অন্তরে তাঁর ঘর।

'সাম্যসাম' কবিতায় প্রথম কোন বাঙ্গালী কবির সামাজিক অসাম্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে দেখি। এই দীর্ঘ কবিতাটি দরিদ্র, অসহায়, বঞ্চিত, নিপীড়িতের জীবন গাথা। পরবর্তীকালে নজরুলের 'সাম্যবাদী' ও 'সর্বহারা' কবিতা সমষ্টির পূর্বসূরী 'সাম্যসাম'। 'সাম্যসাম' বাংলায় প্রথম গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী চেতনা রঞ্জিত কবিতা, এ কবিতাতেই আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রথম সাম্যের মন্ত্র উচ্চারিত হয়।

শতাব্দীর শুরুতে সাম্যের মন্ত্র উচ্চারণ করে কিশোর কবির যাত্রা শুরু, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলন পর্বে তাঁর প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ 'সঞ্চিক্ষণ'। এ কাব্য সত্যেন দত্তের সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় বহন করে। 'সঞ্চিক্ষণ' কবিতার শুরুতে তিনি লিখেছিলেন,

এতদিন। এতদিনে বুঝেছে বাঙ্গালী
দেহে তার আজো আছে প্রাণ।
এ জগতে যোগ্য যাঁরা তাঁহাদেরি মাঝে
আমরাও করে নেব স্থান।
যে খুসী টিটকারী দিক
অন্তরে বুঝেছি ঠিক
এ কেবল নহেক হুজুগ ;
সঞ্চিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ !

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরবর্তীক কাব্য 'বেণুও বীণা' (১৯০৬) গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতাতেও সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলী আবেগের

সঞ্চার করেছে। 'দুর্যোগ' কবিতায় সমকালীন হতাশা রূপায়িত হয়েছে নিম্নোক্তরূপে,

তাপহীন, দীপ্তিহীন, এমনি চলেছে দিন ; —
বঙ্গের এ দুর্যোগের নাহি বুঝি শেষ !
এ জল ফুরাবেনা রে, এ আঁখি শুখাবে না রে ;
ঘুচিবে না বুঝি আর এ মলিন বেশ।
কত দিন আলো নাই, ভুলে যেন গেছি তাই,
কে বলিবে ছিল কিনা ! মূকের স্বপন ;
কবে নাকি, স্বর্ণ ছবি, পূরবে গৌরব রবি
উঠেছিল একবার, হয় গো স্মরণ।

এ কাব্যের 'বঙ্গজননী', 'স্বর্গাদপি গরীয়সী', 'আশার কথা', 'দ্বিতীয় চন্দ্রমা', কবিতায় স্বদেশের প্রতি, 'ধর্মঘট' কবিতায় সমাজের নীচের তলার মানুষের প্রতি, 'কুস্থানাদপি'তে বারাঙ্গনার প্রতি কবির সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। সত্যেন দত্তের 'কুস্থানাদপি' নজরুলের 'বারাঙ্গনা' এবং 'দেবতার স্থান' নজরুলের 'মানুষ' কবিতার পূর্বসূরী। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কুহু ও কেকা' (১৯১২ খ্রীঃ), 'মেথর' কবিতা সমাজে পতিতদের প্রতি কবির সহানুভূতির অপর একটি নিদর্শন ঃ

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি।
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।

এ কবিতায় সত্যেন দত্ত মেথরকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'কে বলে তোমারে, বন্ধু, 'অস্পৃশ্য অশুচি' নজরুল 'বারাঙ্গনা' কবিতায়

বারাঙ্গনাকে সম্বোধন করে লিখেছেন, 'কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও গায়ে' ? 'কুহু ও কেকা' গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি গানের প্রথম কয়েকটি কলি 'মধুর চেয়েও আছে মধুর — সে এই আমার দেশের মাটি, আমার দেশের পথের ধূলা — খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি', নজরুলের একটি গান 'ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি'র পূর্বরূপ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তুলির লিখন' (১৯২৪) কাব্যে 'পরেয়া' কবিতাতে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন,

সমাজের তুমি ভাগ তো কর নি
করেছ ব্যবচ্ছেদ,
যোগের সূত্র কাটিয়া দিয়াছ
গড়িয়াছ জাতিভেদ।
এখন তোমার কাটা মুণ্ডের
কথায় কে দিবে কান ?
কবন্ধটার আস্ফালনের
ভিতরে নাহিক প্রাণ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'অভ্র আবীর' (১৯১৭) কাব্যের 'জাতির পাঁতি', 'নির্জলা একাদশ', 'ইজ্জতের জন্য' প্রভৃতি কবিতায় জগৎ জুড়ে এক জাতি, মানুষ জাতির স্বপ্ন দেখেছেন। এ কবিতাগুলি প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের সমসাময়িক কাব্য 'অভ্র আবীর'। এ কাব্যে মানব জাতির সাম্য ও অখণ্ড রূপের যে ধারণা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় তার উৎসরণ ঘটে থাকতে পারে। নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতা সমগোত্রীয়তে একই আদর্শের পরিচর্যা দেখতে পাই। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'জাতির পাঁতি' কবিতায় লিখেছেন,

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি,
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।

কবিতাটিতে তিনি সকলকে সমান, আদি জননীর পুত্র বলে অভিহিত করে জাতির তর্ক তুলতে নিষেধ করেছেন। বাউরী, চামার, কাওরা, তেওর, পাট্‌নী, কোটাল, কপালী, মালো, বামুন, কায়েৎ, কামার, কুমোর, তাঁতি, তিলি মালি সবাই এ কবিতায় কবির দৃষ্টিতে ভালো। বোন, চাষী, জেলে, ময়রার ছেলে, তামূলী, বাবুই কেউ তুচ্ছ নয়। এ কবিতার মর্মবাণী — মানুষে মানুষে কোন তফাৎ নেই। অস্পৃশ্যদের সত্যেন দত্তই প্রথম আধুনিক বাংলা কবিতায় ঠাঁই দিয়েছেন।

'বেলা শেষের গান' গ্রন্থের অন্যতম কবিতা 'ফরিয়াদ' জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নায়ক ডায়ার সম্পর্কিত। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল ডায়ার পারস্য অভিযান করেছিলেন, সে অভিযান সম্পর্কে লণ্ডনে তার বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লণ্ডনের 'ডেইলী নিউজ' পত্রিকার খবরে প্রকাশ যে ঐ বক্তৃতামালার অনুলিপি অমৃত-সরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিহতদের আত্মীয়দের মধ্যে বিতরণ করা হবে। সেই সংবাদেই ক্ষুব্ধ হয়ে লিখিত হয়েছিল 'ফরিয়াদ' কবিতা যার প্রথম চরণ দুটি হল,

ধূলির অধম নালিশ জানায় তোমার পায়ে ত্রিভুবনের রাজা
তৃণের চেয়েও নম্র যারা, কেন প্রভু এত তাদের সাজা।

প্রসঙ্গক্রমে 'সর্বহারা' কাব্যে সংকলিত নজরুলের 'ফরিয়াদ' কবিতাটি স্মরণীয়,

এই ধরণীর ধূলি — মাখা তব অসহায় সন্তান
মাগে প্রতিকার, উত্তর দাও আদি — পিতা ভগবান।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কবিতায় যে নতুন সুর সংযোজন করতে পেরেছিলেন, কবির মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তিতে তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তুমি বঙ্গ — ভারতীর তন্ত্রী পরে একটি অপূর্ব তন্ত্র এনেছিলে গাববার তরে / কি সে তন্ত্র? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রিদল রুদ্ধদ্বার রাত্রি অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সঙ্কটে পথে পথে, তাহাদের লাগি।
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি কাটাইলে জাগি।
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নি তেজে পূর্ণ করি, অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি ছিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি!

কবি সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, "সত্যেন্দ্রনাথকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথেরই সংলগ্ন কিংবা অন্তর্গত, আর নজরুল ইসলামকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য একজন কবি — ক্ষুদ্রতর

নিশ্চয়ই, কিন্তু নতুন।" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবি ভক্ত ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর মধ্যেও মৌলিক গদ্য লেখক প্রমথ চৌধুরী বা অবনীন্দ্রনাথের মত স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ছিল। জগৎ ও জীবনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে দৃষ্টিভঙ্গী তার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনা বস্তু ও তথ্যকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথের মতো নির্বস্তুক বা অপ্রত্যক্ষ ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয় নি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সাধনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সত্যেন্দ্র সমালোচক হরপ্রসাদ মিত্র লিখেছেন,

> খাঁটি বাংলা ভাষা ও ছন্দের প্রতি আগ্রহ, তদ্ভব ও দেশী শব্দের সঙ্গে তৎসম ও বিদেশী শব্দের বহুল ব্যবহার, তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান এবং বিশেষভাবে স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দের নৈপুণ্য, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, বৈজ্ঞানিক এবং সমকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গ চিন্তা, গীতিকবিতার প্রকারগত বৈচিত্র্যের ও রূপগত কৌশলের প্রয়াস, মিলের বিচিত্রতা, শব্দের অভিনবত্ব, চিত্রকল্পের কৌশল, রবীন্দ্রযুগের একান্ত রবীন্দ্রভক্ত কবি হয়েও প্রাচীন ক্লাসিক্যাল কাব্যাদর্শের প্রতি অনুরাগ, এইগুলি তার কাব্য সাধনার বিশিষ্ট লক্ষণ। এ ছাড়া অনুবাদকের অক্লান্ত অধ্যবসায় ছিলো তাঁর স্বভাবের বিশেষত্ব এবং সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাহিত্য - পর্যালোচকের দৃষ্টি, বৈয়াকরণের শব্দজ্ঞান, ছান্দসিকের সৌষমচিন্তা।

ঐ উদ্ধৃতি থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রবীন্দ্রনাথের সংলগ্ন বা অন্তর্গত হয়েও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সাধনা বিশেষতঃ আঙ্গিক চেতনা বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবের গতানুগতিকতা থেকে

মুক্তি দিতে কম সহায়তা করেনি। সে কারণে শুধু মাত্র সমকালীন কবিদের ওপরে নয় পরবর্তী কালের অতি আধুনিক কবিদের অগ্রগামী জীবনানন্দ দাশের কবিতায়ও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জীবনানন্দ দাশের সমকালীন ইতিহাস চেতনা ও দেশজ শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগ সত্যেন্দ্রনাথের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে জীবিত থেকেও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যুদ্ধোত্তর যুগের দ্বন্দ্বচঞ্চল মানসিকতা দ্বারা পরবর্তীকালের কবিদের মতো আচ্ছন্ন হন নি ঠিক, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে যে গভীর কাল ও সমাজ সচেতনা ছিল তার প্রমাণ তাঁর 'সাম্যসাম', 'শূদ্র', 'মেথর', 'জাতির পাঁতি' প্রভৃতি কবিতা এবং সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কিত কবিতাবলী। উল্লেখযোগ্য সমসাময়িক ঘটননাবলী নিয়ে কবিতা রচনার এই প্রবণতা নজরুলে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

কবি মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮২ — ১৯৫২) আলোচ্য পর্বের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত অন্যতম কবি। নজরুলের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রাথমিক পর্যায়ে হার্দ্যতা এবং পরে তিক্ততামণ্ডিত ছিল। মোহিতলাল মজুমদার 'শাতিল আরব' কবিতার প্রশংসা করে 'মোসলেম - ভারত' সম্পাদককে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে তিনি সাম্প্রতিক কবিতা সম্পর্কে লিখেছিলেন,

> বাঙ্গলার কবি মালঞ্চে আজকাল দারুণ গ্রীষ্ম আসিয়াছে, মলয় সমীরণের অভাবে ব্যজনবীজন চলিয়াছে।... বাঙ্গালা কাব্যের যে অধুনাতম ছন্দঝঙ্কার ও ধ্বনি বৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে মিথ্যারূপিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, ...যে ছন্দ কবিতায় শব্দার্থময়ী কণ্ঠ — ভারতীর ভূষণ না

হইয়া, ইদানিং কেবল মাত্র শ্রবণ প্রীতিকর প্রাণহীন চাতুরীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, ...

সমকালীন কবিতার ঐ গতানুগতিকতা মোচনের পটভূমিকায় মোহিতলালের ভূমিকা বিচার্য। মোহিতলালের প্রথম কাব্য 'দেবেন্দ্র মঙ্গল' (১৯১৯) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রশস্তিমূলক মোলটি চতুর্দশপদী কবিতার সংকলন। এই কাব্যে দেবেন্দ্র প্রভাব স্পষ্ট। দ্বিতীয় কাব্য 'স্বপন পসারী'র (১৯২২) প্রথম কবিতায় কবি মোহিতলালের কাব্য মানসের পরিচয় কিঞ্চিত উদ্‌ঘাটিত,

করি দ্বারে দ্বারে স্বপনের ফিরি —
স্বপন — ব্যাপারী আমি,
নাহি জহরত - পান্না কি হীরক,
মুকুতার হার দামী।
ভুলের ফুলের মোহন মালিকা
গাঁথিয়াছে হের স্বপন - বালিকা!
যে বীণা বাজাতে আলো - নীহারিকা
ছায়াপথে যায় থামি —
তারি সুরে হেঁকে পথ চলি ডেকে,
স্বপন - পসারী আমি।

ভুলের ফুলের মোহন মালিকা কিরিওয়ালা স্বপন - ব্যাপারী মোহিতলাল মজুমদারের স্বপন - পসারীতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব স্পষ্ট, বিশেষতঃ ছন্দ ও শব্দ ব্যবহারে যেমন 'দিল্‌দার' কবিতা,

পেয়ালা যে ভরপুর —
আয় আয়, ধর ধর,

বেয়ালায় সব সুর
কেঁদে যায় ঝর - ঝর।
দিল্ করে হায় হায়
দিল্‌দার আয়না —
আহা, যেন আবছায়
ফিরে কেউ যায় না!
গুণ্‌গুলে মশ্‌গুল্
বিল্‌কুল্ ভর - ভর,
কার ছায়া জ্যোৎস্নায়।
সুন্দর! সুন্দর!

রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন মোহিতলালের 'ক্ষ্যাপা' কবিতাটির প্রথমাংশে সত্যেন দত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও মিশেছে,

শিশুর মত সরল হেসে উঠ্‌ল ক্ষ্যাপা খিল্‌খিলিয়ে —
জ্যোৎস্না - মেয়ের ওষ্ঠচুমি, ঝড়ের সাথে দিল মিলিয়ে।
প্রাণের গানের মন্ত্র গেয়ে করলে সোনা ইট - পাথর,
ফুলের মুষ্টি উঠ্‌ল ফুঁসি সাপের ফণায় কিল্‌বিলিয়ে।

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'পরশ - পাথর' কবিতাটির কথা মনে করিয়ে দেয়, অন্যদিকে অন্ত্য মিল সত্যেন দত্তের অনুসারী। মোহিতলালের 'অঘোর পন্থী' কবিতায় যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় সুকুমার সেন তাকে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও বেদান্ত অদ্বৈতবাদ মিশ্রিত জীবনবাদের সঙ্গে তান্ত্রিক শবসাধনা ও ওমর খৈয়ামি দেহবাদের সংমিশ্রণ বলেছেন,

কাঁচের পেয়ালা ভেঙ্গে ফেল তোরা, লওরে অধরে তুলি
— শ্মশানের মাটী লাগিয়াছে গায় — মড়ার মাথার খুলি !
ভাবে বুঁদ হয়ে, বুদ্‌বুদে ভরা,
বাসনার রঙ্গে রাঙ্গা - রঙ্গ করা,
নীর নাহি যায় - বহ্নির প্রায় সুরায় পড় গো ঢুলি ;
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুর, লও মড়ার মাথার খুলি —
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড় গো সবাই ঢুলি ।

'পাপ' কবিতায় মোহিতলাল ঘোষণা করেছেন, 'পাপ কোথা নাই — গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান' — এ কবিতায় তিনি প্রেম দিয়ে কামনার সৌমরসকে শোধন করার কথা বলেছেন। এই কবিতায় মোহিতলালের জীবন জিজ্ঞাসার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন 'পাপ কারে বলে ? সুখ - খুঁজে ফেরা আঁধার কুটিল পথে ? অথবা ত্যাগ নহে, ভোগ, ভোগ তারি লাগি, যেই জন বলীয়ান' ইত্যাদি। 'স্বপন পসারী' কাব্যের 'নাদির শাহের জাগরণ', 'নাদির শাহের শেষ', 'গজল গান' 'হাফিজের অনুসরণে', 'ঈরাণী', 'শেষ শয্যায়', 'নূরজাহান' কবিতায় মোহিতলাল আরবী, ফারসী শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন, এ ব্যাপারে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুসারী হলেও সত্যেন দত্তের চেয়ে অগ্রসরমান। অর্থাৎ কবিতায় আরবী ফরাসী শব্দের ব্যবহার সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অপেক্ষা মোহিতলালে অধিক।

মোহিতলাল মজুমদারের প্রথম গ্রন্থ 'স্বপন - পসারী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে, একই বৎসরে নজরুলের 'অগ্নি - বীণা' কাব্য প্রকাশিত হয়। মোহিতলালের দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ 'বিস্মরণী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। এ কাব্যে প্রেমের কবিতায় মোহিতলাল দেহ সর্বস্ব ভোগবাদের প্রশ্রয় দিয়েছেন, যেমন,

আমারে করেছ অন্ধ গন্ধ ধূমে দেহ ধূপাধার,
মাদক সৌরভে তার চেতনা হারায় !
বিষ-রস পান করি স্বাদ পাই স্বরগ-সুধার,
—চির-বন্দী আছি তাই স্বপন-কারায় !
অন্ধ আমি, দেহ তাই স্পর্শে হা হা করে,
ধরার ধূলায় তাই ফুল-রেণু ঝরে !
আলো — সে যে উষ্ণ শুধু, জানি কত শীতল আঁধার —
সর্ব-অঙ্গ স্নান করে চুম্বন-ধারায় !

কিন্তু বাংলা প্রেম কবিতায় রক্তিম বাসনার আবেগ সঞ্চরণ অভিনব নয়। মোহিতলালের 'বিস্মরণী' প্রকাশের পূর্বেই নজরুলের 'দোলন-চাঁপা' (১৯২৩) 'ছায়ানট' (১৯২৫), 'পূবের হাওয়া' (১৯২৬) প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সব কাব্য সঙ্কলনে বিভিন্ন প্রেমের কবিতায় কামনা, বাসনা ও দৈহিক আবেগের প্রকাশ ছিল দ্বিধাহীন। 'বিস্মরণী'র উল্লেখযোগ্য কবিতা 'কালাপাহাড়'। এ কবিতাটির ওপরে নজরুলের প্রভাব সম্পর্কে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,

> স্বপন-পসারীর অনেকগুলি কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুসরণ দেখি। সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব মোহিতলাল সযত্নে কাটাইতে যত্নবান হইয়াছিলেন; কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন করিয়া সত্যেন্দ্র প্রভাব জাগিল। কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব কাটিতে দেরি হইয়াছিল। তাহার উদাহরণ ভারতী ১৩৩০ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত কালাপাহাড় ও স্মর - গরল এ (১৯৩৬) সঙ্কলিত রুদ্র - বোধন।

মোহিতলাল (জন্ম ১৮৮৮) ও নজরুলের (জন্ম ১৮৯৯) প্রায় সমবয়সী ছিলেন। কাব্য সাধনায়ও তাঁরা সমকালীন, উভয়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ

একই বৎসর প্রকাশিত হয়, কিন্তু 'অগ্নিবীণা' কাব্য বাংলা সাহিত্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে 'স্বপন পসারী'র প্রভাব সে তুলনায় উল্লেখযোগ্য নয়। মোহিতলালের কাব্যে সমকালীন সত্য নির্বাসিত বলে তাঁর কবিতা সমকালীন পাঠকদের কাছে উপেক্ষিত অথচ বৈপরীত্য সত্ত্বেও মোহিতলাল নজরুলের কবিতা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেন নি। যদিও মোহিতলাল দাবী করেছিলেন যে ১৩২১ সালের পৌষ সংখ্যা 'মানসী'তে প্রকাশিত 'আমি' প্রবন্ধের ভাব সম্পদ নিয়েই রচিত হয়েছিল নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা। কিন্তু মোহিতলালের 'আমি' প্রবন্ধ এবং নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার তুলনা করলে তথাকথিত সাদৃশ্য অপেক্ষা অন্তর্নিহিত বৈসাদৃশ্যই প্রকট হয়ে ওঠে কারণ রচনা দুইটির মূল সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুকুমার সেন মোহিতলালের 'আমি'র ওপর 'অভয়ের কথা'র লেখক ক্ষেত্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭—১৯৫৪) বয়সে মোহিতলাল মজুমদার অপেক্ষা এক বৎসর এবং নজরুলের দুই বৎসর বড়, কিন্তু তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা' (১৯২৩) নজরুলের 'অগ্নিবীণা' ও মোহিতলালের 'স্বপন পসারী'র এক বৎসর পরে প্রকাশিত। তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাব্য যথাক্রমে 'মরুশিখা' (১৯২৭) ও 'মরুমায়া' (১৯৩০)। স্মরণীয় যে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নজরুলের 'অগ্নিবীণা', 'দোলন চাঁপা', 'বিষের বাঁশী' 'ভাঙ্গার গান', 'ছায়ানট', 'সাম্যবাদী', 'পূবের হাওয়া', 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা', 'সিন্ধু হিন্দোল', 'জিঞ্জির', 'চক্রবাক', 'সন্ধ্যা', 'প্রলয় শিখা' 'চন্দ্রবিন্দু' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সমস্ত কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। মোহিতলালেরও প্রথম দুটি কাব্য 'স্বপন পসারী' ও 'বিস্মরণী' ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত। বয়সে বড় হলেও কাব্য প্রকাশে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নজরুল ও মোহিতলাল থেকে পিছিয়ে পড়েছিলেন।

পেশায় ইঞ্জিনিয়ার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রথম তিনটি কাব্যের নামের মধ্যে অভিনবত্ব আছে; 'মরীচিকা', 'মরুশিখা' 'মরুমায়া' তিনটিই মরুভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এ সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন,

> পুস্তকের নামকরণ বিষয়ে আমি চির শ্যামল বাংলা কাব্যে মরুভূমির পর মরুভূমি আমদানী করে একটা কৌতূহল জাগিয়ে তোলবার প্রয়াস কোরেছিলাম।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রথম কাব্য 'মরীচিকা'তে 'ঘুমের ঘোরে' কবিতায় তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে যা বলেছেন তা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কাব্যানুসারীদের প্রতি সমকালীন কবিদের, বিশেষতঃ 'কল্লোল' (প্রথম সংখ্যা ১লা বৈশাখ ১৩৩০) পত্রিকার লেখকদের মনোভাবকে ফুটিয়ে তোলে,

কেন ভাই কবি, বিরক্ত কর! তুমি দেখি সব ওঁচা,
কিরণ-ঝাঁটার হিরণ-কাটিতে কেন চোখে মার খোঁচা!
জানি তুমি ভাল ছেলে,
ঘড়িটি তোমার কাঁটায় কাঁটায় ঠিক যায় বিনা তেলে!
তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমায় — কি আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ?
চেরাপুঞ্জির থেকে,
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি সাহারার বুকে?
সবার খাদ্য প্রতিদিন তুমি বহি 'আন ডালা ভরি';
ক্ষুধিত মানব কেঁদে বলে "তাঁর অপার করুণা, মরি।"
ক্ষুধা দিয়ে দেওয়া অন্ন,
"গরু মেরে জুতো দান" অপেক্ষা নহে কভু বেশী পুণ্য!

'ঘুমের ঘোরে' একটি দীর্ঘ কবিতা এবং এ কবিতায় কবির জীবন জিজ্ঞাসা রূপায়িত হয়েছে। এ কবিতায় কবি খুবই স্পষ্টভাষী, জগতের হেঁয়ালী ও গোঁজামিল তাঁর তীর্যক দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, জীবনের ফাঁকিও বাদ পড়েনি। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও এ কবিতায় কঠোর ও নির্মম,

ঈশা, মুশা আর বুদ্ধ,
কনফুসিয়াস মহম্মদ বা কৃষ্ণ নিমাই শুদ্ধ,
সবাই বলেছে, পাঠালেন মোরে নিজে তিনি ভগবান ;
তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর — তোমাদেরি তিনি চান ;
উপায় পেয়েছি মুহা,—
রবে না নরের জরা ব্যাধি শোক পাপ তাপ আদি দুঃখ ;
যেমন জগৎ তেমনি রহিল, নড়িল না এক চুল ;

শুধু যে জগৎ, জীবন ও প্রথাবদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে দুঃখ হতাশা ও নৈরাশ্যের সুর এ কবিতায় ফুটে উঠেছে তা নয়, সমকালীন বাংলা কবিতা, বিশেষতঃ রবীন্দ্র অনুসারী কবিদের সৃষ্ট বাংলা গীতি কবিতার সাম্প্রতিক হাল এ কবিতায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ও শ্লেষের বিষয়ে পরিণত হয়েছে,

কল্পনা তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বার মাস খেটে লক্ষ কবির এক মেয়ে ফরমাস !
সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশী, বিরহের ফাঁসি, হাঁসা কাঁদা গলাগলি !
নব ফরমাস, দিই তোমা, সাজ' কলুকের পরে কলুকে,
বুকের রক্ত ছলকে উঠুক, হাড়গুলো যাক্ পলকে !
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়, ওই ছুটে যায় — লক্ষ মরণ ঘোড়া,
প্রেমের বলুগা রথাই কসিছে সোয়ায় সে জোড়া জোড়া।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে দুঃখবাদী কবি আখ্যা দেওয়া হয় সম্ভবতঃ জীবন সম্পর্কে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গী কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে তার কারণে, কিন্তু দুঃখ, হতাশা, নৈরাশ্যের সঙ্গে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপের কষাঘাতও এসে মিশেছে। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি একজন সাহসী কবিও বটে। 'মরুশিখা' গ্রন্থের 'দুঃখবাদী' কবিতায় নিম্নোক্ত ঘোষণাই তার প্রমাণ,

শুনহ মানুষ ভাই !
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।
যদিও তোমারে ঘেরিয়া রয়েছে মৃত্যুর মহারাত্রি,
সৃষ্টির মাঝে তুমিই সৃষ্টিছাড়া দুখ - পথ যাত্রী।

যতীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রচলিত মূল্যবোধ ও সনাতন সত্য সম্পর্কে যে সংশয়, যে বেদনা, যে হতাশা লক্ষ্য করা যায় তা 'কল্লোল' পত্রিকার লেখকদের অনেকের রচনারও বৈশিষ্ট্য। মোহিতলাল মজুমদার এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা সমকালীন বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্র অনুকরণ থেকে রেহাই দানে কি ভূমিকা পালন করেছিল সে সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য,

আমাদের তরুণ বয়সে, যখন রবিদ্রোহিতার প্রয়োজনীয় ধাপটি আমরা পার হচ্ছিলাম, তখন যে দুজন কবিতে আমরা তখনকার মতো গত্যন্তর খুঁজে পেয়েছিলাম, তাদের একজন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, আর একজন মোহিতলাল।... আমরা কল্লোলের অর্বাচীনেরা যখন বিস্মিত হয়ে শুনেছি বিস্মরণীর বড় বড় তাল, ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে চলা কল্লোল, সেই সময়েই যতীন্দ্রনাথ আমাদের অভিনিবেশ দাবী করলেন প্রায় উলটো রকমের সুর শুনিয়ে, সহজ, টাটকা, আটপৌরে, এবড়ো খেবড়ো মাঠের উপর দিয়ে চৈত্র

মাসের শুকনো হাওয়ার মধ্যে সুর করে গোরুর গাড়ী
চালিয়ে নেবার সুর।

বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্র কবিতার ব্যর্থ অনুকৃতি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্যে অর্থাৎ রবীন্দ্র সমকালীন বাংলা কবিতাকে স্থবিরতা থেকে মুক্তি দানের জন্যে প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সকলেই কোন না কোন ভাবে অবদান রেখেছেন। কিন্তু নজরুলের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য এই যে উপরোক্ত কবিদের যে বিদ্রোহ তত্ত্বগত নজরুলে তা বস্তুগত। ঐ কবিদের প্রতিক্রিয়া সাহিত্যে সীমাবদ্ধ, নজরুলের প্রতিক্রিয়া সাহিত্য থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিব্যাপ্ত। নজরুলের বিদ্রোহ তাঁর জীবন ও সাহিত্যে একই সঙ্গে কার্যকর। তাঁর সাহিত্য তাঁর জীবন থেকে স্বতন্ত্র নয় সে কারণেও সমকালীন কবিতায় ভিন্ন স্বাদ আনয়নে নজরুলের ভূমিকা বিশেষ কার্যকর। বুদ্ধদেব বসুর কথায়,

> কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উত্থান এমনই সর্বগ্রাসী হয়েছিলো যে তার বিস্ময়জনিত মুগ্ধতা কাটিয়ে উঠতেই দু-তিন দশক কেটে গেলো বাংলাদেশের। এই মাঝখানকার সময়টাই সত্যেন্দ্র গোষ্ঠীর সময়, রবীন্দ্রনাথের প্রথম, এবং প্রচণ্ড ধাক্কা তাঁরা সামলে নিলেন — অর্থাৎ পরবর্তীদের সামলে নিতে সাহায্য করলেন,...যত দিন না 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশান উড়িয়ে হৈ হৈ করে নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছলেন। সেই রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো।... সব সত্ত্বেও একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি।

উনিশ শতকের অপেক্ষাকৃত শান্ত, ঋজু, বলিষ্ঠ, পরিপূর্ণ ও সমুন্নত জীবনের প্রতিভূ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতকের তিন দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মূল ধারা আবর্তিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেই, অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশাতেই নূতন যুগের সূচনা প্রত্যক্ষ করেন। গদ্যে প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, গল্প উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্টি আকৃতি ও প্রকৃতিগত দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস থেকে ভিন্নতর। কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলামের রচনায় লক্ষণীয় পরিবর্তনের সূচনা হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সবুজপত্র' এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কল্লোল' পত্রিকার ভূমিকাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মোহিতলাল মজুমদার বাংলা কবিতায় বুদ্ধিবৃত্তি এবং অতীন্দ্রিয় শুচিবাদের মধ্যে দৈহিক আবেগের উত্তাপ আনয়ন করলেও তাঁর উগ্র ব্যক্তি সচেতনা কবিতাকে আভিজাত্যের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ রেখেছিল, তাই যে বিক্ষুব্ধ যুগ যতীন্দ্রনাথ, নজরুলকে সৃষ্টি করেছিল, যুগের যে বিক্ষোভ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে সমসাময়িকতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এবং রবীন্দ্রাথের কাব্যকেও পরবর্তীকালে প্রভাবিত করেছিল, মোহিতলালে তার আভাস বিশেষ নেই। সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা প্রবাহ রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম পর্যন্ত প্রত্যেকের রচনায় অল্প বিস্তর ছায়াপাত করেছে, কিন্তু সমকালীন সামাজিক বা রাজনৈতিক কোলাহল মোহিতলালকে স্পর্শ করেনি। যুগ সন্ধিক্ষণের বিক্ষোভের কাছে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও পরিপূর্ণ ভাবে আসতে পারেননি। দুঃখ, হতাশা আর নৈরাশ্য তাঁকে শ্লেষাত্মক

করেছিল, সংগ্রামী করেনি। এতদসত্ত্বেও বলা যায় যে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত প্রমুখ কবিদের সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনামূলক কবিতায় সমাজের অনাচারের প্রতি শ্লেষ ও নিপীড়িতদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশের মাধ্যমে। প্রথম মহাযুদ্ধ প্রচলিত মূল্যবোধ ও ধ্যান ধারণার পরিবর্তন আনয়ন করেছিল, বাংলা কাব্যেও রবীন্দ্রোত্তর যুগের সূত্রপাত হয়েছিল। সুতরাং নজরুলের আবির্ভাব বাংলা কাব্যের জন্যে অভাবিত নয়। সর্বোপরি নজরুলের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য সহায়ক হয়েছিল বাংলা কবিতায় নতুন ও ভিন্ন পথ সৃষ্টিতে। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়,

> ...নজরুল বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের পটভূমিকায় ভিন্নতায়। মুসলমান তিনি, সেই সঙ্গে হিন্দু মানসও আপন করে নিয়েছিলেন — চেষ্টার দ্বারা নয়, স্বভাবতই। ...যে হেতু সেই পরিবেশ তাঁকে পীড়িত না করে উলটে আরো সবল করেছিলো তাঁর সহজাত বৃত্তিগুলোকে সেইজন্য কোনো রকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না নিয়েও শুধু আপন স্বভাবের জোরেই রবীন্দ্রনাথের মুঠো থেকে পালাতে পারলেন তিনি, বাংলার কবিতায় নতুন রক্ত আনতে পারলেন।... অন্তত এটুকু তিনি দেখিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব। যে আকাঙ্খা তিনি জাগালেন, তার তৃপ্তির জন্য চাঞ্চল্য জেগে উঠলো নানা দিকে, এলেন 'স্বপন পসারী'র সত্যেন দত্তীয় মৌতাত কাটিয়ে, গেশীগত শক্তি নিয়ে মোহিতলাল; এলো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অগভীর কিন্তু তখনকার মতো ব্যবহার যোগ্য — বিধর্মিতা, আর এইসব পরীক্ষার পরেই

> দেখা দিলো কল্লোল গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা, বাংলা সাহিত্যে মোড় ফেরার ঘন্টা বাজলো।...

প্রথম মহাযুদ্ধে নজরুলের ভূমিকা এ দেশের যে কোন কবির চেয়ে সক্রিয় কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর ভাবজগতে যে সুদূর-প্রসার পরিবর্তনের সৃষ্টি করেছিল তা নজরুলে তত্ত্বগতভাবে আসেনি। মহাযুদ্ধের ফলে রবীন্দ্রনাথের যে প্রতিক্রিয়া (দ্রষ্টব্য, বলাকা কাব্যের ঝড়ের খেয়া কবিতা) এবং ইংরেজী সাহিত্যে যে বিপ্লব দেখা যায় তা নজরুলে এসেছে ভিন্ন ভাবে। নজরুলের কবি জীবনের শুরু সৈনিক জীবনের পর থেকেই আর যে যুগের চারণকবির মর্যাদা তিনি লাভ করেছিলেন, সে যুগের বিক্ষোভ, দ্বন্দ্ব, কোলাহল প্রথম মহাযুদ্ধেরই সৃষ্টি। নজরুল এই যুগের সৃষ্টি, এ যুগের দাবী তিনি মিটিয়েছেন এবং নতুন যুগের তিনি সৃষ্টি করেছেন যার ফলে তিরিশ দশকে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার আগমন ঘটেছিল। দীপ্তি ত্রিপাঠী আবু সায়ীদ আইয়ুবের অনুসরণে আধুনিক কবিতার তিনটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, কালের থেকে আধুনিক কবিতা প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী, ভাবের দিক থেকে তা রবীন্দ্রনাথ থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসী এবং সৃষ্টির দিক থেকে তা নবতর সুরের সাধক। ভাবের দিক থেকে আধুনিক কবিতার যে সব লক্ষণ দীপ্তি ত্রিপাঠী নির্দেশ করেছেন তা হল, রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নূতন সৃষ্টি সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস। বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ, যেমন প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ, ধর্মে সংশয় এবং তৎসঞ্জাত অনিশ্চয়তায় উদ্বেগ। দেহজ কামনা, বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা। ভগবান ও প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস। নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত। বর্তমান

জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ। আত্মা বিরোধী ও অনিকেত মনোভাব, মননধর্মিতা অনেক সময় জ্ঞানের ভারে দুরূহতার সৃষ্টি। বিশ্বের বিভিন্ন অচেতন মনের ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে চিন্তাধারায় অসংবদ্ধতা। আইনস্টাইন প্রমুখ আধুনিক বিজ্ঞানীদের প্রভাব। মার্কসীয় দর্শনের, বিশেষতঃ সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে নূতন সমাজ সৃষ্টির আশা।

আধুনিক কবিতার উপরোক্ত সাধারণ লক্ষণগুলোর মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি লক্ষণের ভিত্তিমূল নজরুলের কবিতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। নজরুলের সাধনার বড় সার্থকতা এই যে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতনভাবে বিদ্রোহী না হয়েও স্বচ্ছন্দে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তি। ভাবধর্মের সঙ্গে শৈলী বা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আধুনিক কবিতায় যে বিবিধ পরিবর্তন দেখা দেয়, তার বিশিষ্ট লক্ষণগুলো অবশ্য নজরুলে স্পষ্ট নয়। তবে প্রবাদ, চলতি শব্দ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে, ভাষা সম্বন্ধে শুচিবায়ু পরিহারে, নূতন চিত্রকল্প সৃষ্টিতে, বিষয় বৈচিত্র্যে ও ছন্দ স্বাচ্ছন্দে নজরুল তিরিশের কবিদের পূর্বসূরী। দীপ্তি ত্রিপাঠী উল্লেখ করেছেন যে জীবনানন্দ দাশ 'ঝরা-পালক' এর যুগ থেকে রবীন্দ্রপ্রভাব এড়াবার জন্যে সচেতন ভাবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং নজরুল ইসলামকে অনুসরণ করেছেন। তিরিশ দশকের আধুনিক বাংলা কবিতায় রোমানটিক বিরোধী নিসি ক্লাসিওজমের সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বে ছিল বস্তুর রূপ মন দিয়ে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস, আধুনিক কবিতায় চোখ দিয়ে বস্তুর সম্পূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা দেখা যায়। নজরুল প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছেন।

ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে নজরুলের পটভূমি বিস্তৃত। হিন্দু, মুসলমান ও ইরাণীয় ঐতিহ্য তাঁর মানসকে অভিষিক্ত করেছে। মুসলমানের

সন্তান হলেও তিনি কেবল মাত্র মুসলিমী বা ইসলামী ঐতিহ্যের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি নিজের ধর্মীয় ও সামাজিক গণ্ডীকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। বাংলাদেশের অপর একটি প্রধান ঐতিহ্যের ধারা হিন্দু ঐতিহ্য থেকেও তিনি সমান ভাবে গ্রহণ করেছেন এবং সাহিত্যে তার সার্থক ব্যবহার করেছেন।

নজরুলের কাব্যে প্রবল ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়েছে, মহত্তর জীবন চেতনা বা আধ্যাত্মিক সত্তার কাছে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে তাঁর মধ্যে জাগরণ দেখা গিয়েছে। সে কারণেই তাঁর কবিতায় সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমে উত্তরণের বা দেহকে ছাড়িয়ে দেহাতীতে যাবার প্রয়াস নেই। তাঁর রূপকল্পে বাস্তব ঘটনার চেতনা বা উপস্থিতি প্রখর। কুলি, মজুর, শ্রমিক, জেলে, বারাঙ্গনা, ঝড়, তুফান, সমাধি, শ্মশান, বিদ্রোহ, বিপ্লব, মৃত্যু সব কিছু তাঁর রূপকল্পে ভীড় জমিয়েছে। প্রকৃতি নজরুলে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। প্রকৃতিকে তিনি নিজের মনের চেহারায় প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রকৃতিতে কোন সত্তা আরোপ করেননি। সমাজ সচেতনতা ও সাম্যবাদী চেতনা নজরুলের অন্যতম প্রধান সুর এবং বাংলা কাব্যে তা এক বলিষ্ঠ সংযোজন। ঐ লক্ষণগুলো আধুনিক কবিতার পূর্বাভাস, তবে যতখানি নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে, যতখানি বুদ্ধি ও মনন প্রধান হলে তিনি আধুনিক কবি হতে পারতেন তা তার মধ্যে নেই। নজরুল নিও ক্লাসিক গুণ আয়ত্ত করেন নি, নানা স্থানে তাঁর মধ্যে পুরোণো কবির স্বভাব প্রবল। মানুষ সম্পর্কে তাঁর ধারণা সাম্যবাদী ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও ধর্মকে তিনি নাকচ করেন নি। স্রষ্টার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ একটা রোমান্টিক বিদ্রোহ বা বিশ্বাসের নামান্তর। কারণ মানুষ, ঘটনা ও বস্তুকে তিনি ধর্ম দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন, ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর যোগ অবিমিশ্র। সমাজ সচেতনতার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি

তাঁর বিশ্বাস একান্ত নয়, মানুষের প্রতি তাঁর যে সহানুভূতি, মানুষের যে জয়গান তাঁর কাব্যে, তা মানবতার সনাতন জয়গান। এ সব দিক দিয়ে বিচার করে বলা চলে যে আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম লগ্নের কবি নজরুল ইসলাম, কিন্তু তিনি স্বয়ং আধুনিক কবি নন অথচ আধুনিক কবিতার সূত্রপাতে তাঁর ভূমিকা ও অবদান মূল্যবান। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশ দশকের আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেবের বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে'র কবিতার মধ্যবর্তী কবিতা প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুলের কবিতা। এ কবিদের সাধনায় নতুন কবিতা রচনার পথ প্রশস্ত হল। সম্ভব হল তিরিশ দশকের আধুনিক কবিতার উদ্ভবের।

আলোচনা

ক. হাসান আজিজুল হক :

সাহিত্য সাধনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজেকে বারবার অতিক্রম করে গেছেন। নিজেই তিনি যা ছিলেন শেষ পর্যন্ত তা থাকেননি এবং যে সর্বগ্রাসী রবীন্দ্র প্রভাবের কথা বলা হচ্ছে তা থেকে রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিরা শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি মুক্ত হতে পেরেছিলেন কি না এটাও আজকে খুবই আলোচনার কথা তো বটেই, চিন্তার কথাও বটে। বরং তিরিশের যুগের সাহিত্যকে প্রধানতঃ প্রতিক্রিয়ার সাহিত্যই বলতে হয়। তার মূল কথাটা ছিল এই যে, রবীন্দ্রনাথ যে ধাঁচে, যে ভাষায়, যে সুরে কাব্য রচনা করেছেন তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পথে আমাদেরকে হাঁটতে হবে। সেটা আজকে, যুগের এই সপ্তম দশক পার হয়ে আসার পরে আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্নতর পথের দিকে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরাও শেষ পর্যন্ত বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথের যে বিরাট প্রভাব, সে প্রভাবের বলয় থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেন নি। তার কারণ হচ্ছে, আমরা যে ভিন্ন সুরের কথা বলছি, সেই ভিন্ন সুরের রেশ রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর নিজের কাব্যের মধ্যে রেখে গেছেন। সেটা ডঃ ইসলাম বলেছেন। এটা বিশেষ করে তিনি স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করে গেছেন বলাকা কাব্যটিতে, যেখানটিতে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আধুনিক বিশ্বের এবং সমসাময়িক সমাজ জীবনের সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক ও অন্যান্য সমস্ত ঘটনার প্রবেশ ঘটেছে এবং সব চাইতে

প্রচণ্ড ভাবে আছড়ে পড়ছে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের মর্মান্তিক প্রভাব। সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের যে মূল প্রসন্নতা, যে গভীর শান্ত সমাহিত বিশ্বাস, যে বিশ্বাসের ছবি তিনি তাঁর প্রথম দিকের কাব্যে প্রতিফলিত করেছেন তার মধ্যে কোথায় যেন একটা দ্বন্দ্ব অস্বস্তি ঢুকে পড়েছে। বলা যায় রবীন্দ্রনাথ কি আস্তে আস্তে বিশ্বাস থেকে অবিশ্বাসে উত্তরিত হয়েছিলেন? রবীন্দ্রনাথ কি মানুষের উপরে যে আস্থা, সভ্যতার উপরে যে আস্থা, মূল্যবোধের উপরে যে আস্থা দিয়ে শুরু করেছিলেন, এই আস্থা কি আস্তে আস্তে তাঁকে বর্জন করতে হয়েছিল? সে প্রসন্নতা আমরা তাঁর কবিতার প্রথম দিকে লক্ষ্য করি, তার ঠিক উল্টোটা — একটা প্রচণ্ড ক্লিষ্টতা তাঁর শেষ দিকে আমরা লক্ষ্য করি। মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের, বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও কয়েক বছর তিনি বেঁচে ছিলেন, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। এই ব্যাপক পরিবর্তন তাঁর সমগ্র কাব্য জীবনে খুব জোরালো প্রভাব ফেলেছিল। ডঃ ইসলাম যদিও এখানে কথাটা বলেছেন, তবুও খুব বলিষ্ঠ ভাবে বলেন নি। এর মধ্যে একটা ব্যাপক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে তাঁর সময়ে যাঁরা কবিতায় ভিন্ন সুরের সাধনা করতে চেয়েছিলেন তাঁরাও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক পিছনেই রয়ে গেছেন।

প্রথমে ডঃ ইসলাম আলোচনা করেছেন প্রমথ চৌধুরীর কথা। প্রমথ চৌধুরী কবিতায় যুক্তি ও মননশীলতার চর্চার কথা বলেছেন। এটা প্রমথ চৌধুরী বিশেষ ভাবে অনুভব করেছিলেন, সত্য কথা। কিন্তু এই দুটি জিনিস রবীন্দ্র কাব্যে অনুপস্থিত, এটা কখনই প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য হতে পারে না। যদিও, যদি একটা সামগ্রিক বিচার আমরা করতে চাই, তাহলে বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল সুর কখনই মননশীলতা ও যুক্তিসিদ্ধতা নয়। সে কথাগুলো অবশ্য

তিনি বলেননি। যদিও আমি বারবার বলছি যে আমার প্রতিটি বক্তব্য, এবং সম্ভবতঃ প্রবন্ধকারের অধিকাংশ বক্তব্যই চূড়ান্ত নয় — সব আপেক্ষিক অর্থে সত্যি। কিন্তু এই সাথে সাথে আমরাও লক্ষ্য না করে পারি না যে রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন গদ্য কবিতা লিখতে শুরু করলেন, যেমন 'লিপিকা' কাব্যগ্রন্থে, — 'কাব্যগ্রন্থ'ই আমি বলছি, কেননা রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেটাকে কাব্যগ্রন্থ বলতে চান এবং বলেছেন যে আমি লাইনগুলোকে যে ভেঙ্গে দেইনি সেটার হয়তো একমাত্র কারণ আমার ভীরুতা। এ যাবৎ কবিতাকে আমরা সোজা টানা লাইনে লিখি কি না। কাজেই 'লিপিকা'কে যদিও আমি কবিতা বলছি, তার লাইনগুলোকে ভাঙ্গতে পারিনি সঙ্কোচভরে এবং কবিতায় যে পদ্যের ব্যর্থতা, গদ্যের যে ঋজুতা এবং সেই সঙ্গে সরাসরি আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে, বিশ্লেষণ ক্ষমতার সঙ্গে যে যোগাযোগ, সেটাকে অস্বীকার করা উচিৎ হবে না এবং কবিতার মধ্যে এইসব উপাদানগুলি যে থাকবে না তাকে যে আমাদের কাব্য জগতে সহজে আমন্ত্রণ করার দরকার আছে সেটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য সাধনার শেষ পর্বে খুব জোরের সাথেই বলেছিলেন।

এরপরে যে কবি সম্পর্কে ডঃ ইসলাম আলোচনা করেছেন তিনি হচ্ছেন ডি. এল. রায়। আমার এইখানে একটি কথা বলবার আছে। যে পাঁচ-জন কবি যাঁদেরকে উনি মোটামুটি ভাবে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্র সমসাময়িক এবং রবীন্দ্রনাথ সে সময় কাব্য রচনা করেছেন, ঠিক সেই সময়ে কাব্য রচনা করলেও ভিন্ন সুরের সাধনায় লিপ্ত রয়েছেন। বলা যেতে পারে, রবীন্দ্র বলয় থেকে এঁরা বাইরে থাকবার চেষ্টা করেছেন। এই যে ক'জন কবির কথা বলেছেন তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়কে অন্তর্ভুক্ত করা কতটা সমীচীন? আমার সে বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ রয়ে গেছে। আমি কথাগুলো বলছি এ জন্যই যদিও মোহিতলাল মজুমদার, সত্যেন দত্ত, নজরুল ইসলাম এঁদের

কথা তিনি বলেছেন তাঁদের সঙ্গে তিরিশের কবিতা নতুন যে যোগসূত্র আমরা খুঁজে পাই, সে যোগসূত্র কখনও কখনই কোন অবস্থাতেই আমরা দ্বিজেন্দ্রলালে খুঁজে পাই না, বরং সেজন্য আমার মনে হয়, রবীন্দ্র যুগে কবিতা রচনা করলেও ডি. এল. রায় সম্ভবত অনেক পিছনের যুগের কবি। দু'টো দিক থেকে সেটা বলতে পারি। তিনি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক দর্শনকে পছন্দ করেন নি। তাহলে কি বলতে পারি তিনি বস্তুবাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছিলেন? আমার আমার তাও মনে হয় না। তিনি বস্তু বা আত্মা কিছুই উপলব্ধি করতে পারেননি। এক কথায় বলা যেতে পারে, তাঁর দৃষ্টি ছিল স্থূল। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতাকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি বলে তিনি যে বস্তুর আত্মাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, একথা কখনই বলা যাবে না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী তাৎপর্যহীন। এ কারণেই 'সোনার তরী' কবিতার উপর তাঁর এত আক্রোশ। অন্য দিক থেকে — রুচির কথা বলবো তখন ডি. এল. রায় — বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে রক্ষণশীলতা ছিল, তিনি তারই অনুরক্ত ভক্ত। কাজেই রবীন্দ্র যুগে একটা ভিন্নতর কাব্যের সাধনা করলেও আধুনিক — বিশেষ করে তিরিশের কবিতা ডি. এল. রায়ের কাছ থেকে যে খুব একটা বিশেষ কিছু পেয়েছে এ কথাটা বলা, আমার মনে হয় না, সামগ্রিক বিচারে মূল্যবান।

মোহিতলাল মজুমদার সম্পর্কে ডঃ ইসলাম চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিরিশের কবিরা বারবার মোহিতলালের কাছে ফিরে গেছেন এটি খুব সত্যি কথা, কিন্তু এর সাথে নজরুল ইসলামের যে সাম্যবাদী চেতনা, সত্যেন দত্তের যে সাম্যবাদী চেতনা — এ দুটোর যোগ যে কেমন করে মেলানো যায় — এটা বলা খুব কঠিন। তবে তিরিশের কল্লোল যুগ সম্পর্কে মনে হয় যাঁরা এক সাথে কাব্য

সাধনা করেছিলেন সম্ভবতঃ তাঁরা একই কথা বলতে চেয়েছিলেন। সেটা আজকে 'কল্লোল যুগ' বলতে যে কবিদের আমরা বুঝি তা সামগ্রিক ভাবে একটি আন্দোলন নয়, অর্থাৎ কল্লোল যুগ বলতে অধিকাংশ কবি পরস্পর ছিন্ন - বিচ্ছিন্ন, আজকে সেটা খুব স্পষ্ট, এবং সে জন্যই আমি দেখতে পাই কল্লোল যুগের নজরুল ইসলামের কবিতার যে ধারা তা কিন্তু সেই অর্থে পরবর্তী কালে খুব বেশী চর্চিত হয়নি। সত্যেন দত্তের যে ধারা, তাও পরবর্তী কালে চর্চিত হয়নি। আমরা বুদ্ধদেব বসুর কথা যদি বলি, সুধীন দত্তের কথাও যদি বলি, সেই সাথে সাথে কল্লোল যুগের আরো দু'জন কবির কথা যদি বলি, তাহলে বুঝব না আধুনিক কবিতার মূল সুর হিসেবে যাকে আমরা চিহ্নিত করছি, বলা চলে না যে রবীন্দ্রনাথ সে পথে একেবারেই যাননি। জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে আমরা বলতে পারবো না যে সাম্যবাদী কোন চেতনার দ্বারা তিনি পুরোপুরি আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু তাতে এই আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা কখনই নষ্ট হয় না। আমরা এইটুকু বুঝতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের কালে উপস্থিত থেকে যাঁরা কাব্যে, বক্তব্যে এবং বহিরঙ্গের আকার প্রকারে একটা পরিবর্তন আনবার প্রচণ্ড চেষ্টা করেছিলেন, তার মধ্যে এই ক'জন কবি পড়েন, এবং এঁদেরই সামগ্রিক আলোচনা এই প্রবন্ধের মধ্যে চমৎকার হয়েছে। আমি মনে করি, এই প্রবন্ধ বিষয়ের দিক থেকে এবং আমাদের সমগ্র কাব্য বিচারের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

খ. ওহীদুল আলম

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভিন্ন সুরের সাধক বলে যদি কাউকে মর্যাদা দিতে হয় তবে আমার মতে তিনি একমাত্র নজরুল

ইসলাম। রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভা থেকে একমাত্র নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কেউ মুক্ত হতে পারেননি। সাধারণ মানুষের জীবন কথাকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যকে তিনি যেভাবে বলিষ্ঠ করে তুলেছেন তা অনন্য। আপনারা নজরুল ইসলামকে প্রাধান্য না দিয়ে সত্যেন দত্ত কিংবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও অন্যান্য কবিকে যে ভাবে প্রাধান্য দিচ্ছেন এটা আমার কাছে খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয়। রবীন্দ্র প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নজরুল ছাড়া আর কেউই ভিন্ন সুরের ঝঙ্কার তুলতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে সত্যেন্দ্রনাথ সবার মাঝেই রবীন্দ্র প্রভাবের সাক্ষ্য রয়েছে, কিন্তু নজরুলে তার কোন চিহ্নই নেই। নজরুলই সেখানে বিক্ষোভের জনক, বিদ্রোহের নায়ক এবং বাংলা কবিতার ভিন্ন সুরের সাধক।

গ. গোলাম মুরশিদ

যে প্রবন্ধটি নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে, আমার ধারণা সেটি অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর উত্তরসাধকদের মাঝখানে যে যোগসূত্র, সেটি সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত ভাবে এখানে সেখানে আলোচনা হলেও ব্যাপকভাবে তা হয়নি। আমার ধারণা শুধু একটি প্রবন্ধ নয়, এযুগের উপর একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা সম্ভব। সে চেষ্টায় ব্রতী হবার জন্য ডঃ রফিকুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের একজন নায়ক অমিত রায় রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেছেন। সে অন্য ভাষার কথা বলতে চেয়েছে। যদিও বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, অমিত রায় যথেষ্ট রবীন্দ্র বিরোধী হতে পারে নি।

আমার ধারণা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে, এমনকি কল্লোল-যুগের কবিরা রবীন্দ্রনাথের যে বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা অনেকটা অমিত রায়ের মত। তাঁরা যথেষ্ট রবীন্দ্র বিরোধী হতে পারেন নি। অথবা প্রথমে রবীন্দ্র বিরোধিতার একটা প্রচণ্ড সূচনা করলেও শেষাবধি রবীন্দ্র আলোকেই আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন এমন কথা প্রাবন্ধিক বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সম্পর্কে একটি কথা তাঁর কবিতায় বলেছিলেন যে 'নানা রবীন্দ্রনাথের মালা দিয়ে যেন তাকে তৈরী করা হয়েছে', এটা বোধহয় সত্য। বছরে বছরে এক কাব্য থেকে আরেক কাব্যে যেতে গিয়ে তিনি বারংবার নিজের রচনাশৈলী, নিজের বলবার বিষয়, ভাষা — এগুলো নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছেন। সে জন্যই তাকে মনে হয় অনেকগুলো রবীন্দ্রনাথের একটি মালা। যাঁরা রবীন্দ্র অনুসারী কবি তাঁরাও শেষাবধি রবীন্দ্রনাথকে সঠিক ভাবে অনুসরণ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ যখন 'বলাকা' কিংবা 'পুনশ্চ' লেখেন, তখন সেই 'পুনশ্চে'র রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেন নি রবীন্দ্র অনুসারী কবিরা। তাঁরা কিন্তু থেমে থেকেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের কাব্যগ্রন্থ নিয়ে। রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হবার প্রয়াসী বলে চিহ্নিত যে সমস্ত কবিরা, তাঁদের প্রসঙ্গেও এই অপূর্ণতার অভিযোগ সত্য বলে আমি মনে করি। যে কবিদের কথা ডঃ ইসলাম বলেছেন, তাঁরা স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হয়ে উঠেছিলেন, এতে কোন ভুল নেই এবং তাঁরা যদি ১৯২০ - ৩০ — এই সময়ে একটা নতুন সুরের স্বপ্ন না দেখতেন তাহলে তিরিশের দশকে অত্যাধুনিক কবিতা আমরা নিশ্চয়ই পেতাম না। তাঁদের সাধনার উপর নির্ভর করেই জীবনানন্দ এবং অন্যান্য কবিরা নতুন যুগের প্রবর্তন করেছিলেন। সুতরাং এই কবিদের স্বাতন্ত্র্যের কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে এই এঁরা কেউই রবীন্দ্রনাথকে সমগ্র ভাবে অতিক্রম করতে

পারেন নি। ভাষায় নয়, ভঙ্গীতে নয়, এমন কি বিষয়বস্তুতেও অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের পিছনে থেকে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পুনশ্চে' সাধারণ মানুষের কথা যে ভাবে বলেছেন এ সমস্ত অনেক কবিই তা বলতে পারেন নি। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে একটা কথা আমি বলে নিতে চাই — সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সুখী মানুষের কথা বলেননি, এটা ঠিকই, কিন্তু তাঁরও আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন। যে পতিতার কথা নজরুল ইসলাম বলেছেন অত্যন্ত সোচ্চার কণ্ঠে, তার কথাই সত্যেন দত্ত বলেছেন তাঁর কবিতায় এ কথা ডঃ ইসলাম বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে দেখি 'চৈতালী'র মধ্যে এই পতিতার মহত্ত্বের ও মানবতার দিক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে বলেছেন। সাধারণ মানুষের বেদনার কথা তাঁর 'চিত্রা' ও 'চৈতালী'তে ধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাথে পরবর্তী কবিদের ব্যবধান এই যে রবীন্দ্রনাথ সাধারণের মধ্যে অসাধারণের স্পর্শ খুঁজে ফিরেছেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রোমান্টিকতা, প্রসন্নতা, মঙ্গলবোধ ইত্যাদি প্রবল ছিল। অত্যাধুনিক কবিদের মধ্যে আমরা অমঙ্গলবোধকে প্রবল হতে দেখি। মাঝখানে যে কবিদের কথা ডঃ ইসলাম বলেছেন — এই কবিরা সাধনা করেছিলেন আর একটি ভিন্ন ভাবধারার, যাকে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি বিক্ষোভবাদের। এই বিক্ষোভ থেকে বিদ্রোহ। এই একটি নতুন সুরের সাধনা এ যুগের কবিরা করেছিলেন। এটা রবীন্দ্র - নজরুল - যতীন সেনগুপ্ত অনেকের মধ্যেই ছিল। আমার মনে হয়, এই বিষয় নিয়ে গভীর এবং বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। এই আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ডঃ ইসলামকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঘ. রফিকুল ইসলাম

দু'টি মূল্যবান আলোচনা হয়েছে তার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে হাসান আজিজুল হক যে ধরণের কথা বলেছেন, আমি তার সাথে একমত। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতার প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁর 'পৃথিবী', তাঁর 'আফ্রিকা' কিংবা 'ঐকতান'। এই সব কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে মহত্ত্বে বা উচ্চতায় আরোহন করেছেন বাংলা কবিতায় এখনো কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া নিজেকে নিজে অতিক্রম করে গেলেও একটি বিষয় — তাঁর যে কোন রচনায় অপর কোন লোক থেকে আলোক এসে পৌঁছায়। আমি যে কবিদের কথা আলোচনা করেছি, তাঁদের কাছে ইন্দ্রিয়াতীত যে সত্য তা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে সত্য, তা অধিকতর মূল্য পেয়েছে। আমি কয়েকজন কবিকে নির্বাচন করেছি, আমি কখনও বলিনি তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেছিলেন। আমি বলেছি তাঁরা সাধনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হয়তো অস্বীকার করে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন — পারেন নি। আর সবাই তাকে স্বীকার করে নিয়ে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরাও পারেন নি, এই হচ্ছে মূল কথা। ধন্যবাদ।